দাম : দশ টাকা

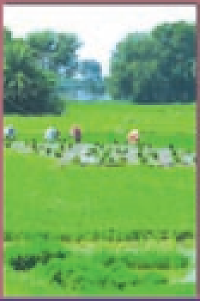

জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের ঘটনা প্রবাহকে অস্বীকার করলে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব

.. পৃঃ ২৭

স্বস্তিকা

শতবর্ষে পল্লীপ্রাণ প্রসাদ চক্রবর্তী

.. পৃঃ ৩৫

৬৭ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা ।। ৬ এপ্রিল ২০১৫ ।। ২২ চৈত্র - ১৪২১ ।। website : www.eswastika.com

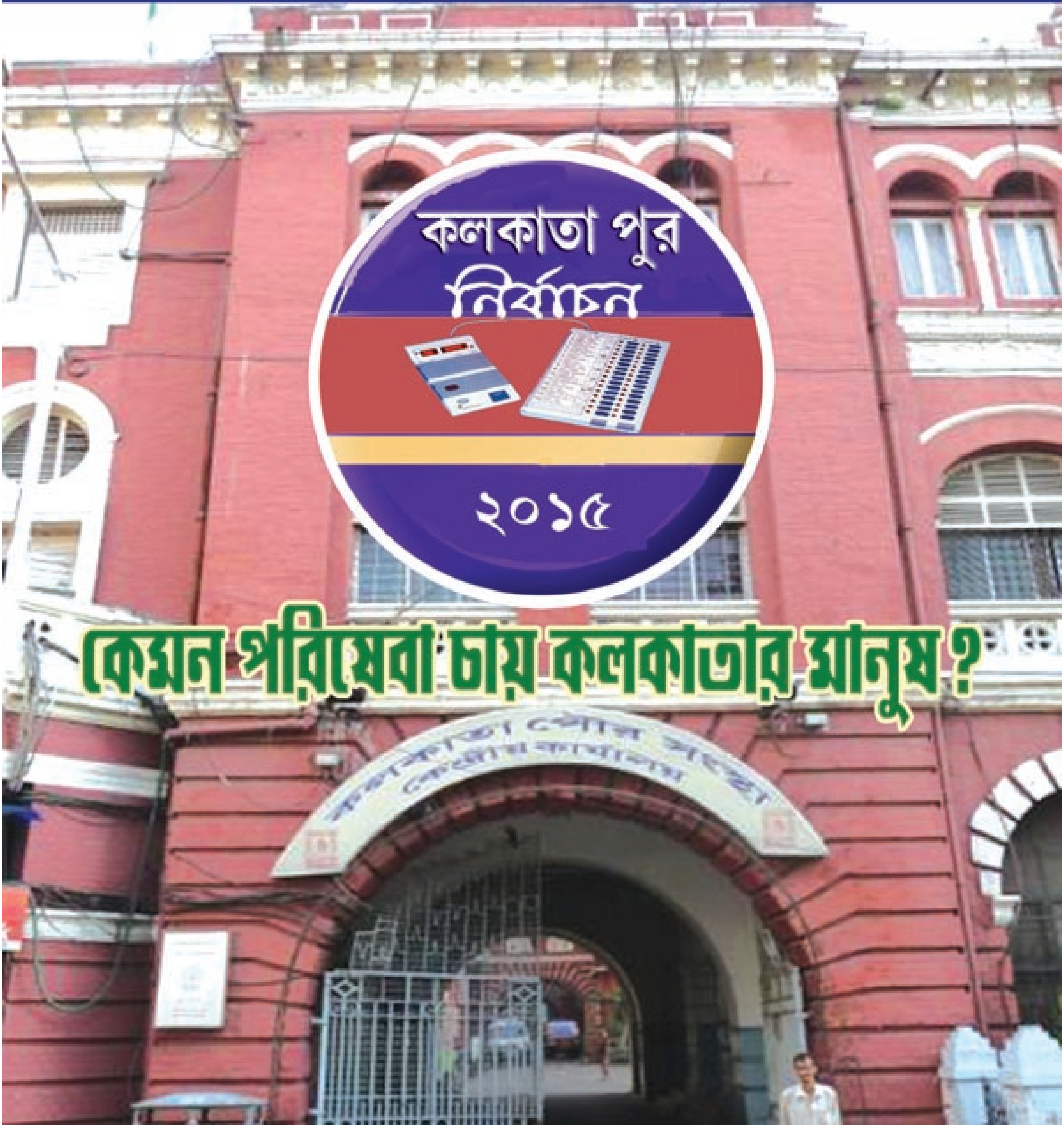

কেমন পরিষেবা চায় কলকাতার মানুষ ?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ২২ চৈত্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

৬ এপ্রিল - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

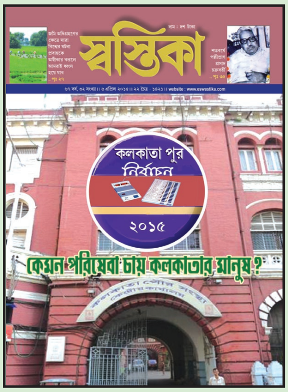

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬

খোলা চিঠি : নীলে নীলে অম্বর পর চাঁদ জব আয়ে.... □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

পরিষেবা নয়, পেশীশক্তি, টাকার জোর আর মুসলমান তোষণই কলকাতা পুরসভার ভোটের ফলাফল ঠিক করে □ রঞ্জিত রায় □ ৮

সাক্ষাৎকার : দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বচ্ছ প্রশাসন ও রাজনৈতিক রক্তক্ষয়ের অবসান চায় বিজেপি : শমীক ভট্টাচার্য □ ১১

লন্ডন চাই না, লুণ্ঠনও চাই না কল্লোলিনী হোক কলকাতা □ পিনাকপাণি ঘোষ □ ১৩

কলকাতাবাসী ঐতিহ্য-সচেতন না হলে মহানগরীর ঐতিহ্য বাঁচবে না □ অর্ণব নাগ □ ১৫

কিছু বিচার কিছু বিশ্লেষণ □ অম্লান কুসুম ঘোষ □ ১৭

অহিংসার মূর্তিমান প্রতীক ভগবান মহাবীর □ বালমুকুন্দ প্রসাদ □ ২১

'লোনার'— এক ভূতত্ত্বীয় ঐতিহ্য □ সৌমেন নিয়োগী □ ২৩

জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহকে অস্বীকার করলে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব □ জয় পণ্ডা □ ২৭

দুর্গা ও কালীপূজায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' পুলিশি ফরমান □ শূলপাণি বর্মন □ ২৯

লাহোরে চার্চে জঙ্গি হামলা, পাকিস্তানের মদতের গুনাগার □ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় □ ৩০

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমর সেবা এবং জনউন্নয়ন প্রকল্প □ দেবব্রত ঘোষ □ ৩১

মায়ের 'প্রসাদ' স্মরণে □ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

পল্লীপ্রাণ সমাজসেবী প্রসাদ চক্রবর্তীর কর্ম-সাধনা □ তপন রীত □ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □

অন্যরকম : ৩৩ □ **সমাবেশ-সমাচার : ৪০-৪১**

প্রাসঙ্গিকী : ৪২

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা
স্বস্তিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা
অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম
—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

HB
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB
AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ
শাহী
গরম
মশলা
AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi
Garam
Masala
SUNRISE
PURE
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশের পরিণাম

পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ তালিবানি রাজত্বের দিকে চলিতেছে। এই রাজ্যে জামাতি মৌলবাদীরা তৃণমূলের সহায়তায় তালিবানি শাসন কায়েম করিতে তৎপর। সংখ্যালঘু ভোটের লালসায় তৃণমূল সরকার ও দল এই রাজ্যকে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি মৌলবাদীদের হাতে তুলিয়া দিতে উৎসাহী। না হইলে বাংলাদেশ হইতে তাড়া খাইয়া এই ভাবে পলাইয়া আসা মৌলবাদী জামাতি দুষ্কৃতীরা পৌর নির্বাচনে তৃণমূলের হইয়া প্রচার করিতেছে কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বকালে দুই বাংলার ইসলামি মৌলবাদীর নিকট স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিয়াছে এই রাজ্য। উল্লেখ্য, তৃণমূলী রাজত্বে বাংলাদেশি জঙ্গিরা এই রাজ্যে আসিয়া নিরাপদে বসবাস করিতেছে। শুধু নিঃশব্দে বসবাস করাই নয়, তাহারা এই রাজ্যেও অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। সম্প্রতি রাণাঘাট কাণ্ডের তদন্তে সিআইডি জানিতে পারিয়াছেন বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের যোগ রহিয়াছে। গোয়েন্দারা মনে করিয়াছেন এই অনুপ্রবেশকারীরাই রাণাঘাটের কনভেন্টে ডাকাতি ও বৃদ্ধা নান-কে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত।

অনুপ্রবেশ এই রাজ্যের একটি প্রধান সমস্যা। ইসলামি মৌলবাদীরা দীর্ঘদিন ধরিয়াই দেশের পূর্বাঞ্চলের জমি দখল করিতে তৎপর। তাহাদের স্বপ্ন বাংলাদেশে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা লইয়া মোগলস্থান গঠন। এই জন্যই অনুপ্রবেশের এত রমরমা। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে সর্বত্র কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই, তাহা ছাড়া নদীই সীমানা হওয়ায় অনুপ্রবেশ করা সহজ। অবৈধ অনুপ্রবেশ চলিতেছে। অনুপ্রবেশকারীদের রেশনকার্ড ও ভোটার কার্ড তৈয়ারি করিয়া দিবার জন্য ভোট কাঙাল রাজনৈতিক দলগুলির উৎসাহের অন্ত নাই। সীমান্ত এলাকায় তাই বৈধ অবৈধ মসজিদ মাদ্রাসার রমরমা। কায়েম হইয়াছে তালিবানি শাসন। তাই বহরমপুরে হিন্দুর ঘরে শাঁখ বাজাইলে ইসলাম বিপন্ন হয়, মুর্শিদাবাদের স্কুলে সরস্বতী পূজা নিষিদ্ধ। ভোটের লোভে শাসকেরা নিশ্চুপ থাকে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদা, দুই ২৪-পরগনার সীমান্ত গ্রামে হিন্দু মহিলারা নিরাপদে বাড়িতে থাকিতেও আজ আতঙ্ক বোধ করিয়া থাকেন। একটু উঁচু ক্লাসে উঠিলেই ছাত্রীরা আর স্কুলে যাইতে চাহে না। শাসকদলের সহায়তায় গো-পাচার চলিতেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়া থাকেন, রাজ্যে অনুপ্রবেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁহার দলের ভূমিকা কী তাহা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। বামসরকার অনুপ্রবেশকারীদের পূর্ণসহায়তা দিয়াছিল, জেহাদি মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়াও বামসরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঢোক গিলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৃণমূল সরকার প্রথম হইতেই অনুপ্রবেশকারী, সন্ত্রাসীদের সমর্থন করিতে থাকে। দুই বাংলার সন্ত্রাসীদের সমর্থন করিতে চিটফান্ডের টাকাও নাকি জলের মতো খরচ করা হইয়াছিল। নিষিদ্ধ সংস্থা সিমির সদস্যকে রাজ্যসভায় মনোনীত করিয়া এবং অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তৃণমূল রাজ্যটিকে অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে তুলিয়া দিতে উৎসাহী।

এই অশুভ উদ্দেশ্যের পরিণাম ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানে স্থানে মৌলবাদী দুষ্কৃতীদের হাতে নারী ধর্ষণ, গো-পাচার এবং সর্বোপরি খাগড়াগড় কাণ্ডে বাংলাদেশি জঙ্গিদের সংযোগ ও রাণাঘাট কাণ্ডে বাংলাদেশি জড়িত থাকা অনুপ্রবেশকারীদের রমরমা প্রতিপন্ন করে। অনুপ্রবেশকারী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তৃণমূল দল এই প্রসঙ্গে নিশ্চুপ থাকিয়া মৌলবাদীদেরই উৎসাহ দিয়া চলিতেছে। কারণ তাহাদের লক্ষ্য যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা কায়েম রাখা।

সুভাষিতম্

গৌরবং প্রাপ্যতে দানাৎ
ন তু বিত্তস্য সঞ্চয়াৎ।
স্থিতিঃ উচ্চৈঃ পয়োদানাং
পয়োধীনাং অধঃ স্থিতিঃ।।

ধন দান করলেই গৌরব পাওয়া যায়। সঞ্চয় করলে নয়। মেঘের স্থান উপরে থাকে এবং সমুদ্রের স্থান নীচে হয়।

সংবাদ প্রতিবেদন

দখলবাজি ও অবহেলায় পুণ্যার্থীরা প্রাণ হারালেন মহাতীর্থ লাঙ্গলবন্দে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় লাঙ্গলবন্দ মহাতীর্থে অষ্টমী স্নান করতে এসে পদদলিত হয়ে প্রাণ হারালেন ১০ পুণ্যার্থী, আহত ৫০ জনেরও বেশি। বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দ দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখলের জন্য এই ঐতিহাসিক তীর্থ সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে প্রাণহানি ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন। জবরদখলের কারণে তীর্থভূমি সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে পুণ্যার্থীদের চাপ সহ্য করার মতো পরিকাঠামো এই পুণ্যতীর্থে নেই। তারই মাশুল গুনতে হলো পুণ্যার্থীদের।

পুরাণে কথিত আছে, পিতা জমদগ্নি মুনির আদেশে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান পরশুরাম কুঠার দিয়ে আঘাত করে মাকে হত্যা করেন। মাতৃহত্যার পাপে সেই কুঠার পরশুরামের

লাঙ্গলবন্দে স্নানরত পুণ্যার্থীরা।

হাতে লেগে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই কুঠার হাত থেকে ছাড়ানো যায়নি। তখন পিতা জমদগ্নি পরশুরামকে তীর্থ ভ্রমণের আদেশ দেন। বলেন, যে তীর্থে হাতের কুঠার খসে পড়বে সে স্থানই হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ। হিমালয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করার পর কুঠার তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে। পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র জলধারা লাঙ্গল চালিয়ে প্রবাহিত করেন, এই জলধারাই ব্রহ্মপুত্র নদ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আর লাঙ্গলবন্দে এসে সেই লাঙ্গল থেমে যায়। সেই থেকে লাঙ্গলবন্ধ বা লাঙ্গলবন্দ পায় শ্রেষ্ঠ তীর্থের স্বীকৃতি। প্রায় পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব এই লাঙ্গলবন্দে এসে স্নান করেন। স্বামী বিবেকানন্দও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশে ১৯০১ সালে চৈত্র মাসের বুধাষ্টমী তিথিতে লাঙ্গলবন্দের রাজঘাটে পুণ্যস্নান সম্পন্ন করেন। নেপালের রাজা মহেন্দ্র বেশ কয়েকবার রাজঘাটে এসে স্নান করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুপূর্ব ইচ্ছা অনুসারে তাঁর চিতাভস্ম প্রয়াগ ও হিমালয়ের পাশাপাশি লাঙ্গলবন্দেও বিসর্জন দেওয়া হয়।

এই পুণ্যতীর্থের প্রায় ৪৭ একর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, স্থায়ী মন্দির ছিল অন্তত ডজনখানেক। দেবোত্তর ভূমির পরিমাণ বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র কয়েক একরে। লাঙ্গলবন্দ এখন ১৬টি স্নানঘাট, গুটিকয় মন্দির ও দখলবাজির কারণে সঙ্কুচিত হয়ে পড়া কচুরিপানায় আকীর্ণ ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। স্নানোৎসবের সময় প্রতিবছরই তিনদিন ধরে মেলা বসে, প্রচুর জনসমাগম হয়। ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকেও পুণ্যার্থীরা আসেন। ইদানীং যাতায়াত ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে, তবে অনেক মন্দিরেরই অস্তিত্ব নেই। বাড়িঘর, দোকানপাট উঠেছে। মালিক অবশ্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের। লাঙ্গলবন্দের বিস্তীর্ণ এলাকা ও আশেপাশের গ্রামে মূলত হিন্দু প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা এবং ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিন্দু সমাজের জন্য বিপর্যয় নিয়ে আসে। শত্রু সম্পত্তি আইনের খড়্গে বলি হয়ে দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়, গ্রাস হয়ে যায় তাদের ভূ-সম্পত্তি, বাড়িঘর। লাঙ্গলবন্দে দেবোত্তর সম্পত্তি ধারাবাহিক ভাবে জবরদখল করা হয়। জবরদখলের পর তৈরি হয় নতুন বাড়িঘর, দোকানপাট। সঙ্কুচিত হয়ে আসে অন্নপূর্ণা ঘাট থেকে প্রেমতলী ঘাট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা।

লাঙ্গলবন্দে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এই প্রথম। গত ২৭ মার্চ ভোরে অষ্টমী তিথি শুরু হলে লাঙ্গলবন্দে ১৬টি ঘাটে স্নানের জন্য পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এবার লাঙ্গলবন্দে প্রায় ১৫ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে বলে মহাতীর্থ স্নানোৎসব কমিটির নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। ঐতিহাসিক কারণেই সবচেয়ে বেশি পুণ্যার্থী সমাগম হয় রাজঘাটে। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে এই ঘাটের প্রায় ২০ গজ দূরে একটি সঙ্কীর্ণ সেতু ভেঙে গেছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়লে পুণ্যার্থীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে দৌড়ঝাঁপ এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ডেকে আনে। দুর্ঘটনার পরপরই ওই এলাকায় ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে মনে হয়েছে, ক্রমাগত

নীলে নীলে অম্বর পর চাঁদ জব আয়ে....

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

ম্যাডাম মুখ্যমন্ত্রী,

চিঠির শুরুতেই আপনাকে নীল অভিনন্দন। ব্লু-ব্লাড সবাই শুনেছে কিন্তু এবার আপনি ব্লু-সিটি শোনাচ্ছেন। অনেক আগেই সে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যের সরকারি দেওয়াল যেন আর্জেন্টিনার জার্সি। আহা মরি মরি! কী লাগছে। আমার তো গলায় খালি গান এসে যাচ্ছে— 'নীলাম্বরী শাড়ি পরে নীল যমুনায়— কে যায়, কে যায়...'

দিদি, আপনার পুরসভা নিয়ম করে দিয়েছে, বাড়ির রং নীল-সাদা করলে করে ছাড় পাওয়া যাবে। আহা কী সিদ্ধান্ত! এই না হলে উচ্চ ভাবনা! আদালত শুনছি এসবে বাগড়া দিতে চাইছে। পাত্তা দেবেন না দিদি। বরং আপনি এগিয়ে যান। এবার ঠিক করে দিন এই শহরের প্রেমিক-প্রেমিকাদের ব্র্যান্ড গান হবে— 'নীলে নীলে অম্বর পর চাঁদ জব আয়ে, প্যার বরসায়ে, হম কো তরসায়ে, এয়সা কোই সাথী হো, এয়সা কোই প্রেমী হো, প্যায়াস দিল কী বুঝা যায়ে...'। এই গান বাজালে নাইট ক্লাবের ট্যাক্সও মকুবের ঘোষণা করে দিন। স্লোগান হোক— নীল সাদা, নীল সাদা, কর বাঁচা, কর বাঁচা...।

দিদিভাই যদি রাগ না করেন তাহলে আরও একটা গান শোনাই। আপনার নিশ্চয়ই পছন্দের লিস্টে আছে। 'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া, ধরেছে যে বায়না, তার চাই লাল ফিতে, চিরুনি আর আয়না'। কেন গাইলাম বলুন তো গানটা? বুঝতে পারেননি! নীল-সাদা চটির দিদিমণিও যে নীল-সাদার বায়না ধরেছেন। আমার নীল-সাদা চাই, আমার নীল-সাদা চাই।

মা দুর্গার কল্যাণে কলকাতা-সহ এই বাংলায় 'থিম' ব্যাপারটা দারুণ চলে। আপনার দলটা তো গোটাটাই একটা থিম। মা-মাটি-মানুষ থিম। লোগোটাও ঘাসফুল। একটা থিম থিম ব্যাপার। আপনার মেলাগুলোও তো সব থিম পরব। এবার রাজ্যটাও হচ্ছে নীল-সাদা থিমের। কালবৈশাখী ঝড় এলে গোটা রাজ্য একসঙ্গে রবি ঠাকুরে গলা মেলাবে— 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর, হে গম্ভীর'। আবার কু-নিকাশী খ্যাত কলকাতা যখন বর্ষার জলে হাবুডুবু খাবে, লোকজন ঘরবন্দি শহরতলিতে তখনও সরকার বা পুরসভাকে গাল না দিয়ে সবাই গান ধরবে— 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে, ওর আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে'। আর তৃণমূল জিতলে (সে যেমন করেই হোক) আপনার কর্মীরা গান গাইবে—

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল...'। ইন্দ্র'নীল', রুদ্র'নীল'রা গান শেখাবে রাজ্যবাসীকে। ওঃ কালচার, কালচার!

আদালত এই কালচারটাই বোঝেনি। আপনার আইনজীবী আসলে বোঝাতেই পারেনি। নীল-সাদার গুরুত্ব বুঝতে পারলে এতদিনের কালো রঙের পোশাক বদলে নীল-সাদার ফরমান দিয়ে দিত হয়তো। আর সেসব না বুঝে প্রশ্ন তুলেছে, নীল-সাদায় কর ছাড় কেন? বরং তাদের ছাড় দেওয়া হোক যারা পরিবেশের কথা ভেবে বাড়িতে বাগান করবে, ময়লা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলবে, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করবে। এসব তো যুক্তির কথা, কিন্তু প্রেমে কি এত যুক্তি খাটে। নীল-সাদা প্রেমটাকে ধরতেই পারছে না সমালোচকরা। 'নীলে নীলে অম্বর পর চাঁদ জব আয়ে, প্যার বরসায়ে, হম কো তরসায়ে...'।

ওসবে কান না দিয়ে দিদি বরং নীল-সাদা-কে জনপ্রিয় করতে আরও কিছু ফরমান ছাড়ুন। আমিই কিছু সাজেশন দিচ্ছি :

□ স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নীলা-সাদা পোশাক পরলে সপ্তাহে একদিন বেশি ছুটি।

□ সরকারি কর্মচারীরা নীল-সাদা পোশাক পরলে বাড়তি ডিএ।

□ পরীক্ষা দেওয়া যাবে শুধুমাত্র নীল কালিতে। খাতাও দেখতে হবে লালের বদলে নীল মার্কারে।

□ নীল-সাদা চটি (হাওয়াই অগ্রাধিকার) পরে গাড়ি চালালে ট্রাফিক আইন ভাঙায় বিশেষ ছাড়।

□ পার্কে নীল-সাদা ছাতার আড়ালে বসা প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিকে নজরই দেবে না পুলিশ।

দেখবেন দিদি, একদিন আপনার এই রঙ এত জনপ্রিয় হবে যে কালার ছেড়ে আবার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মতো ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট সিনেমা তৈরি হবে টালিগঞ্জে। নীল দেখে সেন্সর বোর্ড অবশ্য আপত্তি করতে পারে। আরও জনপ্রিয় হলে হয়তো মা কালীর ভক্তরা লাল জবা ছেড়ে মায়ের গলায় অপরাজিতা আর টগরের কম্বিনেশনের মালা পরাতে চাইবে।

কর ছাড়ের টোপ পাবলিক গিলবেই।

নীল-সাদার জয় হোক।

—সুন্দর মৌলিক

পরিষেবা নয়, পেশীশক্তি, টাকার জোর আর মুসলমান তোষণই কলকাতা পুরসভার ভোটের ফলাফল ঠিক করে

রঞ্জিত রায়

আগামী ১৮ এপ্রিল কলকাতা পুরসভা এবং ২৫ এপ্রিল রাজ্যের ৯২টি পুরসভার ভোট গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কিছু আইনি জটিলতা দেখা দেওয়ায় ওই দু'দিন ভোট গ্রহণ হবে কিনা তা' নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকার যে

বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তার আইনি ও সাংবিধানিক বৈধতা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যে বিষয়গুলি নিয়ে আইনি জটিলতা দেখা দিয়েছে সেগুলি হচ্ছে রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তির বৈধতা যাচাই করা, ছয়টি পুরসভার ভোট স্থগিত রাখার পক্ষে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী কিনা এবং ভোটের দিন ও দফা স্থির করার দায়িত্ব কার? সরকারের অথবা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের? হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর নির্দেশ দিয়েছেন ওই তিনটি বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে ৩ এপ্রিল। এই দুই পক্ষের বক্তব্যের জবাব মামলাকারীকে দিতে হবে ৬ এপ্রিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ৭ এপ্রিল হাইকোর্টের রায় জানা যাবে। অর্থাৎ বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই এবার কলকাতা পুরসভার ভোট হতে চলেছে। এই আইনি জটিলতার জন্য দায়ী রাজ্য সরকার। দেশের সংবিধান বলছে যে পঞ্চায়েত এবং পুরভোট পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সংবিধানের '২৪৩ কে' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ভোটের দিন ও দফা নির্ধারণ করবে কমিশন। রাজ্য সরকার নয়। তবে এইক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তার মতামত কমিশনকে জানাতে পারে। সেই মতামত গ্রহণ করাটা আবশ্যিক নয়। বছর দুয়েক আগে এই প্রশ্নেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট তিন মাস পিছিয়ে যায়। রাজ্য সরকার এপ্রিল মাসে ভোট নিতে চেয়েছিল। হাইকোর্ট তা পিছিয়ে মে মাসে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভোট নেওয়া হয় জুলাই মাসে। ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনের ৮ নম্বর ধারায় ভোটের দিন ও দফা নির্ধারণের অধিকার রাজ্য সরকারকে দেওয়া আছে। এটি প্রাক্তন বামফ্রন্ট সরকারের অপকীর্তি। যতদূর মনে আছে তখন পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর মশাই। নির্দেশ এসেছিল খোদ আলিমুদ্দিন থেকে। সিপিএম তখন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পঞ্চায়েত সব কিছুতেই দখলদারির রাজনীতি করতো। তৃণমূল-নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সিপিএমের রাজনীতিই করছেন। তখন সিপিএম নিজেকে অপরাজেয় মনে করতো। মমতাও এখন তাই মনে করেন। যাইহোক, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ও দফা নির্ধারণের ক্ষমতা নিয়ে ২০১৩ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে যে মামলা হয় তার রায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইনের ৮ নম্বর ধারাটি সংবিধানের ২৪৩ কে অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সুতরাং অসাংবিধানিক। এরপরেও তৃণমূলের সরকার এই অসাংবিধানিক ধারাটি বাতিল করেনি। উল্টে ক্ষমতা দেখাতে এই ধারায় পুরসভার ভোটের দিন ও দফা নিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাই বলছি বেহায়ার যেমন লাজলজ্জা নেই, তেমনি তৃণমূল সরকারেরও নেই। দিদি মনে করেন তাঁর হুকুম দেশের আইন ও সংবিধানের উপরে। দিদির রাজ্যে কার্টুন আঁকলে, পদ্য লিখলে খাঁচায় পোরা হয়।

কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দিন নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও এই গরমের মধ্যেই ভোট গ্রহণ পর্ব হবে তাতে সন্দেহ নেই। রাজ্যের তিন প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং বামফ্রন্ট এই প্রতিবেদন লেখার সময় তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। কলকাতা পুরসভায় মোট ১৪৪টি ওয়ার্ড আছে। গত ১৮ মার্চ বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১৪২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। বাকি দুটি আসনে কিছু জটিলতার জন্য ওইদিন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা যায়নি। এই ১৪২ জন বিজেপি-র প্রার্থী তালিকায় মহিলা প্রার্থী আছেন ৫৮ জন। ১৭ জন মুসলমান এবং ১ জন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রার্থী আছেন। বিজেপি-র এই প্রার্থী তালিকায় চমক হচ্ছে প্রাক্তন তৃণমূল

নেতা বাবলু করিম (৭৫ নং ওয়ার্ড), জানকী সিংহ (ওয়ার্ড ২১) যিনি গত বিধানসভায় নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী ছিলেন, প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার মালা মহলানবিশ, তৃণমূলের একদা রাজ্য সচিব মানস কর (ওয়ার্ড ৮) এবং ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে আসা শশী অগ্নিহোত্রীর (ওয়ার্ড ৮৫) স্থান পাওয়া। প্রার্থী তালিকায় বহিরাগতদের প্রাধান্য দেওয়ায় ৬নং মুরলীধর সেন লেনে বিজেপি-র রাজ্য অফিসের সামনে বিজেপি কর্মীদের একাংশের বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার বক্তব্য, 'আমরা ১৪৪টি আসনের জন্য ২,২৩১টি আবেদনপত্র পেয়েছিলাম। এই বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীদের মধ্য থেকে প্রার্থী বাছাই করাটা সহজ ছিল না। যে সব প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি তাঁদেরই বেছে নেওয়া হয়েছে।' স্বাভাবিকভাবেই যাঁরা প্রার্থী হতে পারেননি তাঁদের অনুগামীরা বিক্ষোভ দেখাবেন। মোটামুটি প্রার্থী তালিকা নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ তৃণমূল এবং বামফ্রন্টেও কমবেশি চলছে।

কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে সবার আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মার্চ মাসের ৪ তারিখে ঘোষিত এই তালিকায় ১৪৪টি ওয়ার্ডে ৬৬ জন মহিলা প্রার্থী আছেন। মুসলমান প্রার্থী আছেন ২০ জন। বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকায় তেমন কোনো চমক নেই। তবে সিপিএমের রাজ্য দপ্তর আলিমুদ্দিন থেকে যে দলীয় প্রার্থী তালিকা সাংবাদিকদের হাতে বিমান বসু তুলে দেন তাতে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৭১টি আসনে লড়বেন মহিলা প্রার্থীরা। মুসলমান প্রার্থী আছেন ২৩ জন।

কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিতবে কারা? এটাই সকলের মূল প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যমের জনমত সমীক্ষায় বলা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসই আবার পুরভবন দখল করবে। জনমত সমীক্ষা যে সর্বদাই সঠিক হয় তা নয়। তবে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনেকেই প্রশ্ন করেন, সারদা, রোজভ্যালি-সহ একাধিক চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে থাকা তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে জেতে কীভাবে? এর নেপথ্যে একটা সহজ সরল গণিত আছে। কলকাতার ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটের ২৫ শতাংশ ভোট তৃণমূলের দখলে । একদা এই মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক সিপিএমের দখলে ছিল। ফলে কলকাতায় সিপিএম ছিল অপরাজেয়। এখন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাররা জানেন যে ক্ষমতার লাঠি যার হাতে তার সঙ্গে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নির্বাচনে তৃণমূলকে হারাতে গেলে এই মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরাতে হবে। সিপিএম নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে মুসলমান কৃষক পরিবারের তিন ফসলি জমি জোর করে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করাতেই বামেদের মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে ধস নামে। শুনতে ভাল না লাগলেও তেতো সত্যিটা হচ্ছে, মমতা যতদিন মুসলমানদের তোষণ নীতি অনুসরণ করবেন ততদিন কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলী রাজ চলবে। ২৫ শতাংশ মুসলমান ভোট এবং ১৫-১৮ শতাংশ হিন্দু ভোট পেলেই কলকাতা পুরসভার শতাধিক আসন তৃণমূলই জিতে নেবে। ভোট শতাংশের হিসেবে তৃণমূল ৩৯ শতাংশ ভোট পায়। অর্থাৎ, ৬০-৬১ শতাংশ ভোটদাতারা তৃণমূলকে পছন্দ করেন না। কিন্তু এই ৬০ শতাংশ ভোট বিভাজিত হয় বামফ্রন্ট, বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। তাই ৩৮-৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃণমূলের হয় জয়জয়কার। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। যাঁরা প্রার্থী হতে না পেরে কলকাতায় বিজেপি-র রাজ্য দপ্তরে বিক্ষোভ দেখচ্ছেন তাঁরা এই সহজ পাটিগণিতটা মাথায় রাখেন না।

কলকাতা পুরসভার একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। বৃটিশ রাজত্বে ১৮৭৬ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কনসোলিডেসন অ্যাক্ট পাশ করে একটি কর্পোরেশন তৈরি করা হয়। এই সংস্থায় ৭২ জন কমিশনার এবং একজন চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। এর মধ্যে ৪৮ জন কমিশনারকে করদাতারা সরাসরি নির্বাচিত করতেন। বাকি ২৪ জনকে বৃটিশ সরকার মনোনীত করতো। ১৮৯৯ সালে শাসক ইংরেজ সাহেবদের স্বার্থরক্ষায় ম্যাকেঞ্জি আইন পাশ করানো হয়। এই আইনে কলকাতা কর্পোরেশনের একচ্ছত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয় ইংরেজ শাসকদের মনোনীত শ্বেতাঙ্গ সাহেব চেয়ারম্যানকে। চেয়ারম্যানকে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করার জন্য যে জেনারেল কমিটি গড়া হয় তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ছিলেন শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ। এঁরা সকলেই সরকার বাহাদুরের মনোনীত সদস্য। এই বৈষম্যের প্রতিবাদে করদাতাদের নির্বাচিত বাঙালি সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন। এরপর ১৯২৩ সালে বাংলায় লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলে

স্বস্তিকা

নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

স্বস্তিকা-র নববর্ষ সংখ্যা ১৪২২ বঙ্গাব্দ-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে আগামী ১২ এপ্রিল ২০১৫, রবিবার, বিকাল ৫টায় মালদহ শহরের বি এস রোড, বেলতলাস্থিত রামকল্যাণ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন মালদহ বাদলমণি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ওই বিদ্যালয়েরই সহ-শিক্ষক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদার মহাশয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'স্বস্তিকা সম্মানে' ভূষিত করা হবে। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

ভবদীয়—

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক : স্বস্তিকা

বিজয় আঢ্য
সম্পাদক : স্বস্তিকা

সেই সরকারের মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইন পাশ করিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। মহিলাদেরও ভোটাধিকার দেওয়া হয়। প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতা পুরসভার প্রথম নির্বাচিত মেয়র হন। তাঁর চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার ছিলেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৩ সালের আইন বলবৎ ছিল ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। এরপরেই তৎকালীন রাজ্য সরকার কলকাতা পুরসভার পরিচালনার দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে।

১৯৫১-৫২ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন চালু হয়। এই আইনে পুরসভাকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান করা হয়। এই নবগঠিত পুরসভায় মোট ৭৬ জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। একমাত্র কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য। ১৯৬২ সালে আইন সংশোধন করে সর্বপ্রথম কলকাতার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে পুরসভার ভোটে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কলকাতা পুরসভার অধীনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫ থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ করা হয়। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভার অনুমোদনে কলকাতা পুরসভা অধিগ্রহণ করে সেখানে মুখ্য প্রশাসক করে অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস আমলাকে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর ১৩ বছর পরে বামফ্রন্ট সরকার 'দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট' চালু করে পুরসভাকে স্বাধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুরূপ পুরসভার প্রশাসনিক পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্বাচিত পুর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত মেয়র ইন কাউন্সিলকে। মেয়র প্রধান নেতা। রাজনৈতিক কারণে বা ভোটে জিততে তখনকার লালদুর্গ বলে পরিচিত যাদবপুর, সাউথ সাবার্নবান এবং গার্ডেনরিচ এলাকাকে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যুক্ত করে বামফ্রন্ট সরকার। বামেদের সেই লালদুর্গ ধূলিসাৎ করে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এখন কলকাতা পুরসভা। বাঙালি জনমানসে তীব্র বামবিরোধী মনোভাব এবং মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে চওড়া ফাটল তৃণমূলকে পুরসভার ক্ষমতা দখলে সাহায্য করে। বর্তমানে শোভন চট্টোপাধ্যায় পুরসভার মেয়র। প্রসঙ্গত, বলে নেওয়া ভাল যে ২০১৩ সালের নভেম্বরে রাজ্যের পাঁচটি পুরসভার নির্বাচন হয়। এর মধ্যে লালদুর্গ বলে পরিচিত ঝাড়গ্রাম এবং কৃষ্ণনগর সিপিএমের হাত থেকে তৃণমূল কেড়ে নেয়। নির্বাচনে সিপিএম বিধ্বস্ত হয়। তাছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর পুরসভাও তৃণমূল তার দখল বজায় রাখে। ২০১৩ সালে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে তৃণমূল নেতাদের কেচ্ছাকাহিনি তেমনভাবে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়নি। তখনও জনমানসে বাম বিরোধিতা প্রবল ছিল। সেই হাওয়ায় সাফল্য এসেছিল তৃণমূলের। এখন সেই প্রবল হাওয়া নেই। মমতাকেও সততার প্রতীক মনে করেন না সাধারণ মানুষ। তাই তৃণমূল এখন পুরোপুরি মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল পার্টি। ভোটে জিততেই মমতা রমজান মাসে মাথায় হিজাব পরে সান্ধ্য ইফতারে নিয়ম করে উপস্থিত থাকেন। রাজনীতিকদের ভেক্ ধরতে হয়। ভেক্ না ধরলে ভোট ভিক্ষা পাওয়া যায় না।

কলকাতা পুরসভার ভোট হয় ওয়ার্ড ভিত্তিক পুর পরিষেবার ভাল বা মন্দের বিচারে। কলকাতা পুরসভা তৃণমূলের হাতে ছিল। এই সময় ত্রিফলা আলো নিয়ে আর্থিক দুর্নীতিতে স্বয়ং মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় মশাই ফেঁসে যান। ভোটের প্রচারে ত্রিফলা আলো কেলেঙ্কারি বিরোধীরা তুলে ধরবেন। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে রাস্তা, আলো, জল নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, সাফাই ইত্যাদির কাজ নিয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সন্তুষ্ট অথবা নয়। কারণ এইগুলিই পুরসভার প্রাথমিক দায়িত্ব। নির্বাচনে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে ধরে নিতে হবে যে বিদায়ী তৃণমূলের মেয়র পরিষদ নজরকাড়া ভাল কাজ করেছে। হ্যাঁ, এইরকমই হওয়া উচিত। বাস্তবে তা মোটেই হয় না। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে সাফল্য নির্ভর করে মুসলমান ভোট, পেশীশক্তি আর কালো টাকার খেলায়। পুরসভার নির্বাচনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন প্রচারে। বাস্তবে একজন প্রার্থী খরচ করেন ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ওই তথ্য জানে। যুক্তি দেখানো হয় যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রার্থীদের খরচের হিসাব দেখতে পর্যবেক্ষক আছেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নেই। তাই সব জেনেও চোখ বন্ধ রাখতে হয়। আবার বলছি, পেশি শক্তি, টাকার জোর এবং মুসলমান ভোট কলকাতায় পুরসভার ভোটের ফলাফল ঠিক করে। পুর পরিষেবার উন্নতি নয়। পুর ভোট কড়া নাড়ছে। আগামী বছর বিধানসভার নির্বাচন। এখন রাজনৈতিক দলের কাছে মুসলমানেরা হঠাৎ দামি হয়ে উঠেছেন। ফুরফুরা শরিফের মেঠো পথে সূর্যকান্ত মিশ্র-আবদুল মান্নানদের দেখা যায় ত্বহা সিদ্দিকির সঙ্গে সালাম আলেকুম করতে। গত চার বছরে রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচিকে ছাপিয়ে গেছে তৃণমূল সরকারের মুসলমান তোষণ নীতি। মুখ্যমন্ত্রীকে দলের বিভিন্ন সভা সমাবেশে 'ইনশাল্লাহ', দোওয়া, হিজাবে দেখতে দেখতে খোদ বামেরা পর্যন্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে পাড়ি দিয়েছেন ফুরফুরায়। ব্যতিক্রম শুধু বিজেপি। মুসলমানরা হজে যাবে তাই এদের আরও একটা হজ টাওয়ার হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। গরিব মুসলমানের বাড়ির ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসাতেই পড়বে। ফলে অস্তিত্ব থাক না থাক ১০ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন দিলেই মুসলমানদের শিক্ষার সমস্যা মিটে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী ধরেই নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষিত মুসলমান একমাত্র নজরুলের ভক্ত। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ পড়েন না। সুতরাং বিদ্রোহী কবিকে মাইনরিটি কোটায় ফেলে তাঁর নামাঙ্কিত আকাডেমি বানালেই মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অনায়াসে বলে দেওয়া যাবে, 'সব করে দিয়েছি।' রাজ্যের মুসলমানরা বিলক্ষণ বোঝেন যে ভোট এলে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস সব দলেরই দরদ উথলে ওঠে। তবু তাঁরা প্রতারিত হন। পরে বোঝেন, 'যা বলেছিল তার কিছুইতো আমাদের দিল না।' নির্বাচনের সময় ক্যামেরার সামনে নামাজি টুপি মাথায় দিয়ে পাঁচ বছর মুসলমানদের টুপি পরানোর রাজনীতি বন্ধ না করলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা থাকবে। যেহেতু এই তোষণের রাজনীতি বদল হয়নি, তাই কলকাতা পুরসভার দখল রাখার লড়াইতে শাসকদলই এগিয়ে আছে। ▌

দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বচ্ছ প্রশাসন ও রাজনৈতিক রক্তক্ষয়ের অবসান চায় বিজেপি : শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা-সহ রাজ্যের পুরসভাগুলিতেও ভোট আসন্ন। পুরভোটের প্রাক্কালে রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির-র একমাত্র বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন স্বস্তিকার প্রতিনিধি *শুভাশিস রায়*। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হলো।

▯ **পুরভোট দরজায় কড়া নাড়ছে। পুরভোটে বিজেপি-র প্রচার জনসাধারণের কাছে কতটা পৌঁছতে পেরেছে?**

▯ গত লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি-র দিকে মানুষের একটা ঢল নেমেছে। যাঁরা ভিন্ন রাজনৈতিক দল করতেন তাঁরা যেমন আসছেন, অতীতে যাঁরা বামপন্থী ছিলেন তাঁরা এবং ঘরছাড়া মানুষও দলে এসেছেন। সমস্ত ধরনের মানুষই আমাদের দলে আসছেন। সেখান থেকে বলা যায় পার্টির একটা প্রসারতা সর্বত্রগামী হয়েছে। কিন্তু তার পুরোপুরি ফসল তোলার মতো যে সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োজন সেটা অনেকেই বলেছেন এই মুহূর্তে বিজেপি-র হয়তো নেই। বিভিন্ন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমরা তা প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ফল বিভিন্ন ধরনের হয়েছে।

▯ **তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস দল ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলিব্রিটি ক্রমশ ভিড় বাড়াচ্ছেন বিজেপি-তে। এতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের আক্ষেপ— দলের কাছে এঁদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। দল কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে পুরনোদের দিক থেকে?**

▯ এটা একদমই ঠিক কথা নয়। কলকাতা কর্পোরেশনে ১৪৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সেখানে ক'জন রয়েছে যে যারা রাজনৈতিক কর্মী নয়। মানুষকে আর তো কুমোরটুলিতে গিয়ে তৈরি করা যায় না। সমাজে যে সকল মানুষ রয়েছে তাদের নিয়েই চলতে হবে। তাদের মোটিভেট করতে হবে, তাদের আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যদি সেটা না করা যায় তাহলে সেটা নেতৃত্বের ব্যর্থতা। এটাই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। আমরা কখনো পুরনো কর্মীদের ছেঁটে ফেলে দিই না। বিজেপিতে এটা কোনোদিন ঘটেনি।

▯ **কিন্তু এরকমই তো ঘটেছে বীরভূমে। দক্ষ সংগঠক দুধকুমার মণ্ডল জেলা সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এরকম হওয়ার কারণ কী? কেন হলো?**

▯ যেভাবে তিনি পদত্যাগটা করেছেন এবং যে কারণে করেছেন পাবলিকলি তা কোনো পদ্ধতি নয়। এটা অনভিপ্রেত। ওঁর মতো একজন রাজনৈতিক নেতা যাঁর দীর্ঘ অতীত রয়েছে তাঁর কাছে এই পদত্যাগপত্রটি সাধারণের মতো করে দেওয়াটা উচিত হয়নি। দল চালাতে গেলে সমস্ত দলের মধ্যেই এইরকম কিছু সমস্যা থাকতে পারে। এটা আমরা দেখছি।

▯ **এই পুর নির্বাচনে বিজেপি কী কী ইস্যু তুলে ধরতে চায় সাধারণ মানুষের কাছে?**

▯ দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বচ্ছ প্রশাসনের লক্ষ্যে এবং এই রাজ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ, রাজনৈতিক রক্তক্ষয় বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই বার্তা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে দিতে চাই। প্রত্যেকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে তৃণমূল এক প্রকার একাধিপত্য স্থাপন করতে গিয়ে সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বর চেপে দিয়েছে। কিন্তু বিজেপি নয়। কিছু মিউনিসিপ্যালিটিতে আমাদের প্রতিনিধিত্ব আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে সংখ্যার নিরিখে বড় দল নয়। তবে এটা ঠিক, প্রতিটি মিউনিসিপ্যালটিতে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে— ফলস্ বিল দিয়ে পাবলিক মানি আত্মসাৎ করা হচ্ছে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট যা করতে পারেনি তৃণমূল এই ক'দিনে তা করে ফেলেছে।

■ **দুর্নীতি এত থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাতে দেখা গেছে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল ১০১টি আসন পেতে চলেছে। বিজেপি পেয়েছে ৮টি আসন। পিছিয়ে যাওয়ার কারণ কী বলে মনে করছে বিজেপি?**

■ সমীক্ষাতে বিশ্বাস নেই আমাদের। এটা সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে পৌরসভার নির্বাচনের একটি ফারাক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি মেরুকরণের রাজনীতি। যদিও বসিরহাটের নির্বাচন থেকে মেরুকরণ ভাঙা সম্ভব হয়েছে। তাই বলতে পারি আমরা আশাতীত ফল করব এই নির্বাচনে।

■ **মূলত একটি অভিযোগ, কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে একই ঠিকানায় বহু ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। যা অস্বাভাবিক। বিজেপি যদি পুরবোর্ড দখলে করে তাহলে তা কীভাবে মোকাবিলা করবে বলে ভাবছে?**

■ এই দুর্নীতি সর্বত্র। এদের দুর্নীতি শুধুমাত্র ত্রিফলা বা ট্রেড লাইসেন্সে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা চাই একটি ঠিকানায় একটি মাত্র ট্রেড লাইসেন্সই ইস্যু করা উচিত। নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জটিলতা কাটানোর চেষ্টা করা হবে। এক কথায় আগামীকাল থেকে বন্ধ করে দিলাম— তা সম্ভব নয়। তবে আমরা এলে এর মোকাবিলা করব এবং আইন মেনে কাজ হবে।

■ **কলকাতার বস্তিবাসীদের বহু দিনের সমস্যা মূলত আর্বজনা, পানীয় জলের এবং জমা জলের। বিজেপি তাদের সুরক্ষার ব্যাপারে কী চিন্তাভাবনা করেছে?**

■ বিজেপির স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশ জুড়ে চলছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। মেয়র শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন এই জার্মানি থেকে মেশিন আসছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে মেশিন আসছে। বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তুলবেন বলেছিলেন। আদৌ কি উন্নতি হয়েছে? বস্তিগুলির সামনে গেলে তা দেখা যায়। কলকাতা শহরে যে উন্মুক্ত ভ্যাটগুলি রয়েছে তার সামনে গেলেই বোঝা যায় কলকাতা পৌরসভার ক্ষমতায় থেকে তৃণমূল কী কাজ করেছে। জলের সমস্যাও রয়ে গেছে। আমরা চেষ্টা করব এই দুই সমস্যা মেটাতে। তবে রাতারাতি এই অসুবিধা দূর করা যায় না। মানুষ যদি আমাদের উপর আস্থা রাখে তাহলে আমরা তা পারব।

■ **একটু বৃষ্টিতেই কলকাতায় জল জমে যায়। কেউই এই সমস্যা দূর করতে পারেনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে?**

■ এই সরকারের আমলে নতুন করে এক সমস্যা দানা বেঁধেছে। যে জমি দিয়ে এই জমা জল নির্গত হোত সেখানে পেশীশক্তির বলে বহুতল নির্মাণের কাজ চলছে। যেখানে এই জমিগুলিতে নির্মাণের কাজ করাই যাবে না। এমনকী তৃণমূল ভবনের পিছনের জমিতেও জবর দখল করে কাজ চলছে। বহু জায়গায় বেআইনি মল তৈরি হয়েছে। তবে আমরা ক্ষমতায় এলে এই জমা জল দূর করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

■ **কলকাতার ৭০ নম্বর ও ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড অবাঙালি অধ্যুষিত ওয়ার্ড। এরকম অনেকগুলিই রয়েছে। লোকসভা ভোটে এদের ৯০ শতাংশ ভোট আপনাদের দিকেই ছিল। কিন্তু এই পুরভোটে এদের সমর্থনের পাশাপাশি সংখ্যালঘু ভোট কতটা পেতে আশাবাদী?**

■ লোকসভা ভোটে আমরা সংখ্যালঘু ভোট পাইনি। লোকসভা ভোটে আমাদের একটু দুর্বলতার কারণে এবং কিছু কিছু বক্তৃতার ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে সংখ্যালঘু ভোট আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এটা ঠিক। লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রথম আমাদের যিনি শহীদ হলেন তার নাম শেখ রহিম। ৬ জন সংখ্যালঘু খুন হয়েছেন। সংখ্যালঘুরা বিজেপিতে আসছেন। তারা বুঝতে পারছে তাদের ভুল বোঝানো হয়েছিল এতদিন। এবং উন্নয়নের নামে তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। হিন্দিভাষী এবং বাংলাভাষী ভোটার বলে আমরা ভাগ করতে চাই না। কারণ বাংলাভাষী ওয়ার্ডে হিন্দীভাষী প্রার্থী করা হয়েছে। আবার বাংলাভাষী প্রার্থীও হয়েছে অবাঙালি ওয়ার্ডে।

■ **৭টি পুরসভার মেয়াদ ৬ মাস আগেই ফুরিয়েছে। মেয়াদ ফুরনোর আগেই যে নির্বাচন হওয়া উচিত তা হয়নি। বিজেপি কি মনে করছে?**

■ এই সরকার মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে সিপিএমের কায়দায় অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে যাচ্ছে। এই সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না। তাই তারা নির্বাচন করায়নি। তাদের ভয় নির্বাচনে গেলেই জমি হারাতে হবে।

■ **বিজেপি-র সাফল্য কতটা আশা করছেন এই পুরভোটে?**

■ এই ভোটে বিজেপি আশাতীত সাফল্য পাবে। আমরা নজর কাড়া সাফল্য পাব।

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

পুরভোট : কলকাতা

লন্ডনও চাই না, লুণ্ঠনও চাই না কল্লোলিনী হোক কলকাতা

পিনাকপাণি ঘোষ

মহাকরণ গঙ্গাপার হয়ে হাওড়ায় চলে গেলেও রাজধানী সে রাজধানীই। তাই তো কলকাতা পুরসভা রাজ্যের বাকিদের থেকে ধারে ভারে আলাদা। ভোটও তাই আলাদা। কদিন বাদেই প্রায় গোটা রাজ্যে পুরভোট। শহরে শহরে গরম পিচের গন্ধ বুঝিয়ে দিচ্ছে সামনেই ভোট বসন্ত। তারও আগে মিনি মহাকরণ মানে এই নীল-সাদা যুগেও ছোট লাল-বাড়ির নয়া বোর্ডের খোঁজে ভোট পর্ব। কিন্তু সেই ভোটের আগে কলকাতা কী চায়? কেমন পরিষেবা চায় শহর কলকাতার মানুষ? নিজের রাজধানী শহরকে কেমন দেখতে চায় রাজ্যের মানুষ?

ভোটের যে তোড়জোড় তা দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই কলকাতা কী চায়। আসলে সেসব চাওয়াকে কে পাত্তা দেয়? ভোট তো হয় রাজনীতি দিয়ে। শক্তি দিয়ে। বাম আমলেও ভোটারদের বাড়ির গেটে তালা ঝুলিয়ে আটকে রেখে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। আর ঘাসফুল আমলেও ভোটারদের চোখে সরষেফুল দেখানো চলেছে। সুতরাং গায়ের জোর, পয়সার জোরের কাছে ভোটের বাজারে ভোটারের চাওয়ার জোর বরাবরই হেরো। তবু মানুষ কী চায় তা জানতে কলকাতার মানুষ আর কলকাতাকে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকা যাঁদের, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেই বোঝা গেল চাওয়াগুলো খুবই সামান্য। কিন্তু পাওয়াটাই হয় না।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথাশিল্পের জোরে কলকাতাকে লন্ডন বানাতে চাইলেও কলকাতা মনে মনে কলকাতাই থাকতে চায়। সেকথা জোরে বলতে অবশ্য ভয় পায়। তাহলে সেই গলা তোলা কলকাতার গায়ে মাওবাদী না হলেও বিরোধী শক্তির তকমা লেগে যেতে পারে। মনে মনে কলকাতা চায়, লন্ডন বানাতে হবে নাগো, একটু আধুনিক করে দাও শহরটাকে। লুণ্ঠন করো না করের টাকা।

ভোটের আগে সরকারকে কল্পতরু হতে হয়। পুরসভাই বা হবে না কেন? মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় (মুখ্যমন্ত্রীর আদরের কানন) কদিন আগে সেই কাজটাই করলেন। হুতোমপ্যাঁচা বেঁচে থাকলে লিখতেন— 'কলকাতায় যেন গাজনের মেলা হচ্চে। সহরের চারিদিকে ঢাকের বাদ্যি শুনা যাচ্চে। মালকোঁচা মেরে ভোটবাবুরা নেচে বেড়াচ্চে। কাজের ধুম পড়েচে। সম্বচ্চর নিবে থাকা তেবাতি আলো জ্বলচে। চকচক কচ্চে। রাস্তা হচ্চে, গেরস্তের দালান নীল-সাদা হচ্চে। নগরবাসী শসব্যাস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।'

ভোটের ঘণ্টা বাজতেই পুরসভার মেয়র পরিষদের শেষ বৈঠকে কাজ অনুমোদন আর লোক নিয়োগের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন মেয়র। তৃণমূল কংগ্রেসের এলাকার ক্লাবগুলোকে কিছুদিন আগেই ২ লক্ষ টাকা করে বিলিয়েছিলেন মেয়র সাহেব। এবার সেই সব এলাকাতেই ভোটের মুখে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে। সময়ে সব কাজ শেষ না হলেও সময়ে খরচ করে ফেলতে হবে। ভোট বলে কথা।

কলকাতায় মোট ওয়ার্ড : ১৪৪	
জঞ্জাল অপসারণে স্থায়ী কর্মী ৭ হাজার, অস্থায়ী কর্মী ১৪ হাজার	
বাড়তি নিয়োগে বরাদ্দ	
বরো ১০	১৫ লক্ষ ৩৯ হাজার
বরো ১১	২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৩ হাজার
বরো ১২	২ কোটি ১১ লক্ষ ১৭ হাজার
বরো ১৪	৩ কোটি ১০ লক্ষ ৯০ হাজার
বরো ১৫	৪ কোটি ৪০ লক্ষ ২৬ হাজার

মুখ্যমন্ত্রী যখন মিটিং করবেন তখন কেউ যদি দেখিয়ে দেয়, এই তো রাস্তা নেই, জঞ্জাল আছে! তবে? বিরোধীদের এলাকায় আবার সেই ভাঙা, জঞ্জাল ভরা রাস্তা দেখিয়েই বলবে দেখে আসুন আমাদের এলাকা, আর এই দেখুন ওদের এলাকা। কিন্তু মেয়র এবং পুরবোর্ডটা যে গোটা কলকাতার সেটা আর কে বলে দেবে! এই নগরের তিনিই যে মহানাগরিক।

যাইহোক, রাজনীতি শাস্ত্রেই বলা আছে ভোটে নিয়ম নাস্তি। সে নিয়ম মেনেই দলীয় কর্মীর জোগান বাড়াতে পুরবোর্ড একেবারে শেষ বেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাড়তি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। আর তার গোটাটাই শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা এলাকায়। সেই হিসেব দেখে শিখতে হবে—'কাকে বলে পাইয়ে দেওয়া।'

গোটা দেশেই স্বচ্ছতা অভিযানের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই হিসেবে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগ তো ভালোই। কিন্তু গোটা কলকাতায় শুধু খান পাঁচেক বরোতেই কেন

স্বচ্ছতা-প্রীতি? তাছাড়া কিছুদিন আগেই শহরকে জঞ্জালমুক্ত করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ৫০-এর বেশি স্বয়ংক্রিয় কম্প্যাক্টর মেশিন বসানো হয়েছে। আর তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কর্মী সংখ্যা কমানো। তবে বাড়তি লোক নিয়োগ কেন? করের টাকা অপচয়ে বুক কড় কড় করছে না!

ভোট যে বড় বালাই সে আর কে না জানে? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আরও ভালো করে জানেন। তাই তো ২০১৪ সালেই পুরসভাকে ১৫৫ কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে। কথায় কথায় তিনি বলেন, রাজ্যের ভাঁড়ে মা ভবানী। যদিও সারা বছর তাঁর দান-খয়রাতি চলে। আর লোকসভা ভোটের পর রাজ্যের রাজনীতির হাওয়ার এলোমেলো ভাব দেখেই কলকাতা পুরসভায় ফিরে আসার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। আদেশ পেয়েই অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অর্থ মঞ্জুর করে দেন।

কলকাতা পুরসভাকে টাকা দিতেই পারে রাজ্য সরকার। কিন্তু তাবলে নিজের আয় কমিয়ে পুরসভা রাজ্যের করের টাকায় ভাগ বসাবে কেন? আসলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তো তাঁর পছন্দের হাওয়াই চটির নীল-সাদা রং করিয়েদের কর ছাড় দিতে হয়। তাঁর পছন্দের ব্যবসায়ীকে সুবিধা দিতে হয় পুরসভাকে। বেঙ্কটেশ ফাউন্ডেশন প্রাইভেট লিমিটেডকে লেকমল তৈরিতে ‘বিশেষ’ সুবিধা পাইয়ে দিতে রাজস্ব বাবদ সরকারের ক্ষতি প্রায় ২৪ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় চিত্রনির্মাতা শ্রীকান্ত মেহতার জন্য বিশেষ ছাড় দিতে গিয়ে লিজের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ প্রাপ্য ২৪ কোটি টাকা থেকে খরচ কমে মাত্র ৭ লক্ষ টাকা। নিয়ম মেনে ওই মলের বর্গফুট প্রতি ভাড়া হওয়ার কথা ৪ টাকা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা মল থেকে ভাড়া বাবদ কলকাতা পুরসভার আয় বর্গফুট প্রতি মাত্র ১ টাকা ৩৬ পয়সা। এমনকী পুরসভার থেকে বাজার লিজ নিয়ে সেখানে অন্য সংস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেআইনি লিজ চুক্তিও করেছে বেঙ্কটেশ ফাউন্ডেশন প্রাইভেট লিমিটেড। মেনে নিয়েছে পুরসভা।

তাই তো কলকাতা বলছে, লন্ডন চাই না। লুণ্ঠনও চাই না।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কলকাতা হবে লন্ডন, দার্জিলিং হবে সুইজারল্যান্ড, দীঘা হবে গোয়া, সুন্দরবনে হবে আফ্রিকান সাফারি। কেন যে নকল করতে হবে সেটা অবশ্য তিনি বলেননি। তবে একটা বিষয় বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি এইসব এলাকাকে সাজাতে চান। পর্যটনে জোর দিতে চেয়েছিলেন। মানুষের আয় বাড়াতে চেয়েছিলেন। কলকাতাবাসী তথা রাজ্যবাসীর তাতে আশাও জেগেছিল। কিন্তু সেসব আশা এখন অতীত। সবাই বলতে লেগেছেন— ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।’

কতটা আধুনিক হয়েছে কলকাতা? এখনও রাত্রি ন'টা বাজতে না বাজতেই রাস্তা থেকে ভ্যানিস হতে শুরু করে ট্রাম-বাস। রাতের সার্ভিস নামেই আছে। অটো থেকে ট্যাক্সি চলে নিজের মর্জিমতো। যাত্রীদের হেনস্থা অনেক সাধারণ ব্যাপার, শারীরিক নিগ্রহও সইতে হয়। বাদ যায় না মহিলা শিশু। পরিবহণমন্ত্রী জেলে। আর পরিবহণে যেন আলাদা প্রশাসন। বেগতিক বুঝে আইনভাঙা ট্যাক্সিচালকদের শাস্তি ও জরিমানা কমিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মেয়েদের নিরাপত্তা? সেসব তো সাজানো ঘটনা।

আর কলকাতা কেমন সাজানো? অন্ধকার রাস্তা অন্ধকার। আলোয় ভরা রাস্তায় সৌন্দর্যায়নের ত্রিফলা। জঞ্জালের গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সিগন্যালে দাঁড়ানো গাড়ির যাত্রীদের শুনতে হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত— ‘ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়...’

গোটা কলকাতা শহরের খাল, ভেড়ি, পুকুরের উপরে বাঁশের মাচা করে ছেঁড়া বস্তা ঘেরা অস্থায়ী শৌচাগার। অথচ ২০১৪ সালের ১৯ নভেম্বর গোটা বিশ্বের সঙ্গে কলকাতাও পালন করেছিল ‘বিশ্ব শৌচাগার দিবস’। স্লোগান তুলেছিল, ‘উই কান্ট ওয়েট’। তবু রাস্তার পাশেই শৌচকর্ম করেন কলকাতার একটা বড় অংশের মানুষ। বিমানবন্দর থেকে পাঁচতারা হোটেল যাওয়ার পথে ইচ্ছা না থাকলেও তা দেখতেই হবে এই শহরে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটক কিংবা শিল্পপতিদের। তথ্যটা লজ্জার হলেও সত্যি যে দেশের সাতটি মেগাসিটির মধ্যে সমীক্ষায় শৌচাগারের নিরিখে কলকাতার স্থান সবার নীচে।

কলকাতার বস্তিগুলির অবস্থা তো মারাত্মক। তাই বস্তিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশীর মতো থাকে ডায়রিয়া, জন্ডিস, কলেরা, টায়ফায়েড। কলকাতা পুরসভা সূত্রে পাওয়া একটি তথ্য বলছে, এই শহরে মোট বস্তি ৩ হাজার ৩৩৪টি। বসবাস করে মোটামুটি ৩ লক্ষ পরিবার। এখনও পর্যন্ত শৌচাগার তৈরি হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মতো। অর্থাৎ ৫০ শতাংশেরও বেশি বস্তিবাসী শৌচকর্ম সারেন খোলা জায়গায়। প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থকে কলকাতায় আসেন গড়ে ২০ লক্ষ মানুষ। শহর জুড়ে মাত্র ৩৫০টি সুলভ শৌচাগার সেই সংখ্যার জন্য যথেষ্টই কম। সুতরাং...

এতদিন শহরবাসীই মনে মনে বলেছে, লন্ডন চাই না। এখন লন্ডন নির্মাণের প্রবক্তা মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন, লন্ডন চাই না, ভোট চাই।

তাই তো তিনি ভোটের মুখে হকারদরদি সরি গরিবদরদি হয়ে উঠলেন। কাঁচা রসিদের পরিবর্তে পাকা লাইসেন্স। উলটে বিমার সুবিধা। এক লক্ষ হকার মানে এক লক্ষ ভোটার। অঙ্কটা তো বুঝতে হবে। বাম সরকার হাতিবাগান, গড়িয়াহাটে অপারেশন সানশাইন করেছিল। বাদ গিয়েছিল অবাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলি। এমনকী শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা, চাঁদনি চত্বরও। এবার তৃণমূল সরকার গোটা শহরটাকেই হকারদের দখলে দিয়ে দিতে দিলদরিয়া। আগেই ফুটপাথ থেকে পথে নেমেছে হকারদল। এবার পথের দখল নিতেও আর বাধা থাকবে না। কারণ, ‘চলমান হকার’ও সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। পথচারী ফুটপাথ ছেড়ে পথে নেমেছে আগেই। এবার মাঝ রাস্তায় যেতে হবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। পথের গাড়ি তবে জটে আটকে থাকবে নাকি ফুটপাথে উঠবে? এভাবেই কি লন্ডন হবে কলকাতা? নাকি ‘লণ্ঠন’ যুগে ফিরে যাবে? কলকাতার এই ভোট কি পুরসভার ভিতরেই সত্যিকারের ‘অপারেশন সানশাইন’ ঘটাতে পারবে? নাকি এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে লাল-সবুজ- গেরুয়া শিবিরের ভোট লড়াইয়ের আড়ালে ভিজে চোখে দাঁড়িয়ে থাকবে দেশের প্রাক্তন রাজধানী?

কলকাতাবাসী ঐতিহ্য-সচেতন না হলে মহানগরীর ঐতিহ্য বাঁচবে না

অর্ণব নাগ

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতাকে লন্ডন বানানোর প্রতিশ্রুতিতে আইনত কোনো বাধা নেই। ইতিহাসগত ও ভৌগোলিক কিছু বাধা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো বাধাটা আসতে পারে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। এহেন সত্যটা প্রশাসনিক স্তরে যেমন উপলব্ধির প্রয়োজন তেমনি কলকাতাবাসী যদি তা অনুভব না করেন তাহলে কলকাতার ইতিহাস বাঁচবে না, তার ঐতিহ্যগাথাও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। একথা অনস্বীকার্য বর্তমানে যে কলকাতার সাবেকিয়ানা আমাদের গর্বের বস্তু, বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রভাব তাতে অনিবার্য। কিন্তু কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণক এবং এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট তা মেনে নিতে কলকাতার বহু ইতিহাসবেত্তারই আপত্তি রয়েছে। বহু প্রাচীন গ্রন্থে কলকাতা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং জোব চার্ণকের পদার্পণের বহু আগেও কলকাতার অস্তিত্ব ছিল খুব ভালোভাবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও কলকাতাকে মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলা নিজেদের বাণিজ্য স্বার্থেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল ইংরেজদের কাছে। তবে সেই বৃটিশ বাণিজ্য-নগরীতেই বাঙালি এনেছিল নবজাগরণের, নবচেতনার উন্মেষ। সেই সাবেকিয়ানা, সেই ঐতিহ্য, সেই ইতিহাসই আজ রক্ষার বড়ো প্রয়োজন, অন্তত আত্মবিস্মৃত জাতির বিস্মরণের বদনাম ঘোচানোর একটি অধ্যায় হিসেবে।

গত কয়েক দশকে কলকাতার আকাশ-সীমা দ্রুত পাল্টে গেছে কোনো সন্দেহ নেই। বদলেছে শহুরে চরিত্রও। ডালহৌসি (বি বা দি বাগ) চত্বর আগে যে চাকুরিজীবীদের মূল ক্ষেত্র বা গন্তব্য ছিল এখন তার গতিপথ অনেকখানি বদলেছে। মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিং নামক প্রশাসনিক মুখ্যভবনও গঙ্গার উল্টোপাড়ে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। তবে কর্মচরিত্র বদলেও পাশ্চাত্য-স্থাপত্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যশালী ভবন আজও সেখানে অটল মর্যাদায় দাঁড়িয়ে। সমস্যা সেখানে নয়। ঐতিহ্য যেখানে বিপদগ্রস্ততার সম্মুখীন তার নাম উত্তর কলকাতা। রাজ্যের গৌরব কি স্মরণ করিয়ে দেয় না? বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতি আজকের দিনে তার সাবেকিয়ানা ধরে রাখতে যথেষ্টই সংগ্রাম করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর কলকাতার বনেদিয়ানা ধরে রাখা আজ একান্তই প্রয়োজন, অন্তত বঙ্গ-সংস্কৃতির তাগিদে।

এ বিষয়ে পৌর উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতানুটি পরিষদ, সুতানুটি বইমেলা কমিটির মতো সংগঠনের এতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব রয়েছে এবং তাঁরা তা পালন করেনও।

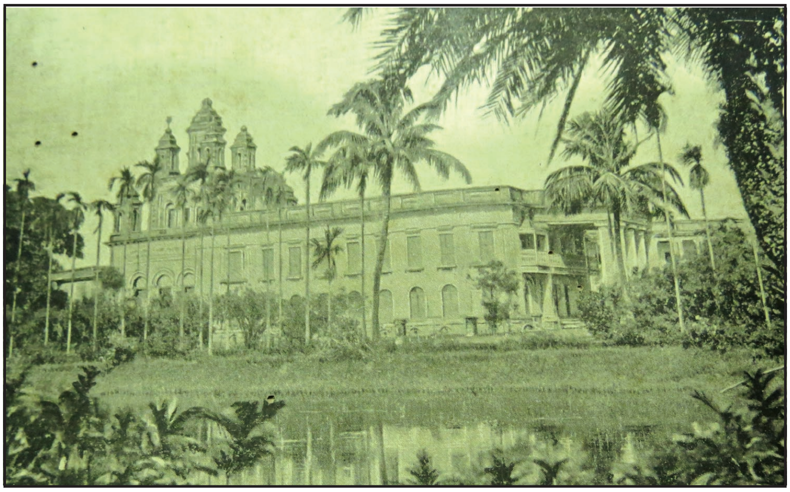

শোভাবাজার রাজবাড়ির নবরত্ন নাটমন্দির। কলকাতা পুরসভা অধিগ্রহণের মাধ্যমে সংস্কারের পর তার কৌলিন্য হারিয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন পরিকল্পনায় সাবেক উত্তর কলকাতা কতটা ঠাঁই পেয়েছে বা আদৌ কতটা পাবে তা বলা খুব মুশকিল। বাইপাসের মতো ঝাঁ চকচকে রাস্তা, কিংবা শহরজোড়া ফ্লাইওভার, বা চোখ বাঁধানো শপিং মল একটি আধুনিক মহানগরীর পরিচয় বহন করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘিঞ্জি, অপরিসর গলি, খসে পড়া পলেস্তারা কল্লোলিনী তিলোত্তমার অতীত রামধন মিত্র লেনের মতো একটি ছোট্ট অপরিসর রাস্তা দিয়ে এগোলে মূলত এঁদের জন্যই চোখে পড়বে অতীত সুতানুটির গৌরব-গাথা। ফুটবলার দুখীরাম মজুমদার, সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বীরুপাক্ষ-খ্যাত এবং অবশ্যই মহালয়ের ভোরে যাঁর কণ্ঠ আজও বাঙালিকে স্মৃতিমেদুর করে সেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি ছিল এখানে।

রাস্তার দু'পাশের ফলক তারই ঐতিহ্য-বহন করছে। উত্তর-কলকাতার প্রতিটি অংশে এভাবেই পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে অতীত-সমৃদ্ধি। তার ক'টা অংশে আমরা ফলক বসাতে পেরেছি?

হস্তান্তর একটি বড়ো সমস্যা। বাড়ি একবার হাতবদল হয়ে গেলে অতীত ঐতিহ্যও চুলোর-দোরে যায়। যেমন সিমলার শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্রের বাড়িটি বিশ শতকের গোড়ায় হাতবদল হয়। বাড়িটি কেনেন কবিরাজ ভুবনেশ্বর শর্মা। এই বাড়িতে রামকৃষ্ণদেব বহুবার পদার্পণ করেছেন। মিত্রদের সেই আবাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসও গিয়েছে। বর্তমানে ভুবনেশ্বর শর্মার বংশধরেরাই সেখানে বাস করেন। কিন্তু এই ঐতিহ্য প্রচারে তাঁরা অনাগ্রহী। তাঁদের আশঙ্কা এসব প্রচারিত হলে রামকৃষ্ণ মিশন এসে হয়তো তাঁদের বসতবাটীতে থাবা বসাবে। একই আশঙ্কা ৭, রামতনু বসু লেনস্থ স্বামী বিবেকানন্দের মাতামহী রঘুমণি দেবীর বাড়িটির বর্তমান মালিকদের। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিবেকানন্দ জননী ভুবনেশ্বরীদেবীর দৌহিত্র-বংশীয়রা পরবর্তী কোনো এক সময়ে বিক্রয় করে দেন। বাড়িটির বর্তমান অংশীদারেরা এখানে কেউ ইতিহাস খুঁজতে গেলে তাকে মারতে বাকি রাখে আর কি!

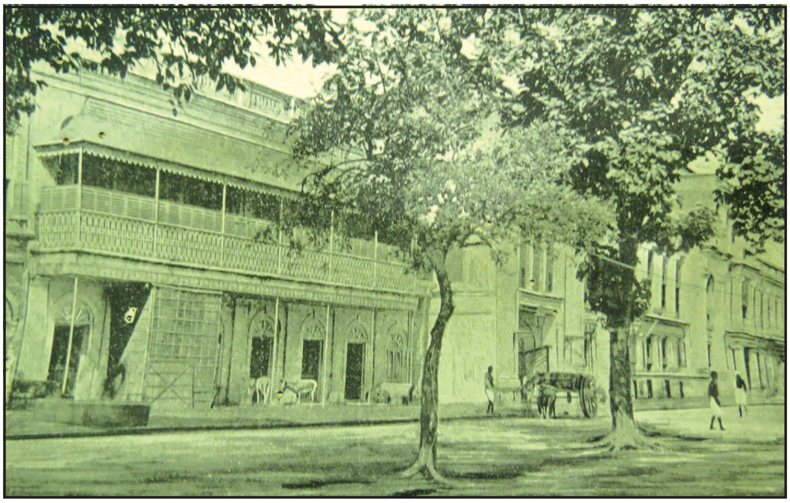

শোভাবাজার রাজবাড়ির সেকালের চিত্র। বর্তমানে এখানেই জয়পুরিয়া কলেজ ও অন্যান্য বহুতল।

একথা ঠিক বাড়ির হাতবদল একবার হয়ে গেলে পূর্বতন মালিকের আর কোনো দাবি-দাওয়া থাকে না। কিন্তু ঐতিহ্য, ইতিহাস তো আর পাল্টায় না। আর যাঁরা সেই ইতিহাসের কাণ্ডারি, তাঁরা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো পরিবার নয়, তাঁরা এই সমাজেরই সম্পদ— ঐতিহ্য বাঁচাতে এই মানসিকতা আজ প্রয়োজন।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বর্তমান জয়পুরিয়া কলেজ ছিল আসলে শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণদেবের মহল। তাঁর দুই পুত্রই ছিলেন সাহিত্যসেবী। প্রথমজন নীলকৃষ্ণদেবের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হতে পেরেছিল রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা।' আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যতদিন থাকবে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র বিনয়কৃষ্ণদেবকে বাঙালি মনে রাখবে। এহেন জয়পুরিয়া কলেজে কেবল জয়পুরিয়াদেরই স্মৃতি। এঁরা সেখান থেকে হারিয়ে গিয়েছেন চিরতরে। আসলে আমাদের ঐতিহ্য-চেতনা এখন দুর্গাপুজোতেই সীমাবদ্ধ। শোভাবাজার রাজবাটীর ঠাকুরদালান তাই আমাদের কাছে সমগ্র রাজবাড়ি হিসেবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আকারে-প্রকারে এর সুবিশাল আয়তনের কোনো ইয়ত্তা পাওয়া যাবে না মূলত ঠাকুরদালান বাদে বাকি অংশ বিক্রি হয়ে তার কাঠামো আমূল বদলে যাওয়ায়। আসলে কলকাতার সুপ্রাচীন বনেদি বাড়িগুলি টিকে আছে স্রেফ ঠাকুরদালানের জন্য। যেমন ঝামাপুকুর রাজবাড়ি। তবে এহেন ঠাকুরদালানগুলিকে দেখলে, তার অলংকরণ, ভাস্কর্যগুলিকে দেখলে অতীত ঐতিহ্য কিছুটা মালুম হয়। তাই শুধু ভক্তিশ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা হিসেবে নয়, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের শেষ সম্বল হিসেবে দেখে এই ঠাকুরদালানগুলিকে রক্ষা করা আশু প্রয়োজন। অনেক বনেদি বাড়িতেই এনিয়ে ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। এটা আশার কথা তাতে সন্দেহ নেই।

তবে পৌর উদ্যোগ একান্তই জরুরি। শুধু ফলক বসানোতেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কলকাতার স্ট্যাচুগুলো অবহেলায় পড়ে রয়েছে। পুর-উদ্যোগ নেই। গঙ্গারপাড়ে সৌন্দর্যায়ন হচ্ছে বটে, সেইসঙ্গে ইতিহাসকেও ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরসভার হেরিটেজ কমিটি থেকে বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে চিত্রশিল্পী, চিত্র নির্মাতাদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। এরপর বনেদি বাড়ি প্রমোটারের হাতে যাওয়া ঠেকানো যাবে? শোভাবাজার রাজবাড়ির যে নবরত্ন নাটমন্দির পুরসভার হাতে এসেছিল তার স্থাপত্যকীর্তির কী হাল হয়েছে তা সবাই জানেন।

এই সচেতনতা কিংবা ইতিহাসবোধ না থাকলে কলকাতার ইতিহাস কিংবা সাবেকিয়ানা বিলুপ্তির প্রহর গুনবে (যা ইতিমধ্যেই গুনতে শুরু করেছে)। ঠনঠনিয়ার মিত্র-বাড়ির অবশিষ্টাংশ আজ বিক্রয়ের অপেক্ষায়। কিংবা চোরবাগানের মিত্র-বাড়ির একাংশ আজ সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। পুরসভার পাশাপাশি এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজও তার দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না। উত্তর-কলকাতার বনেদিয়ানা না বাঁচলে কিন্তু সেই কলকাতা বাঁচবে না, যে কলকাতা আপামর বঙ্গবাসীকে নবজাগরণের দিশা দেখিয়েছিল, মনীষী-সঙ্গমে ভারতবর্ষকে উদ্দীপিত করেছিল, সর্বোপরি স্বাধীনতার স্বাভিমান জাগিয়ে বৃটিশ-বিরোধী কণ্ঠকে উচ্চগ্রামে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিল। ■

কলকাতা পুরভোট

কিছু বিচার কিছু বিশ্লেষণ

অম্লান কুসুম ঘোষ

গণতন্ত্রের পূজারি দেশ ভারতবর্ষ। ভারতীয় গণতন্ত্রের নানা দিক, নানাবিধ মুখ। সবকটি দিকই দর্শিত হয় বিভিন্নরকম নির্বাচনের মাধ্যমে, সবকটি মুখই পুষ্ট হয় মতপ্রকাশরূপী খাদ্যের দ্বারা। প্রায় প্রত্যেক বছরই তাই লেগে থাকে নানারকম নির্বাচন। সেরকমই একটি নির্বাচন হলো নাগরিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার নির্বাচন অর্থাৎ পুরসভা এবং পঞ্চায়েত-এর নির্বাচন। এবছর পশ্চিমবঙ্গে হতে চলেছে মোট ৯৩টি পুরসভার নির্বাচন, তার মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান শহর কলকাতার নির্বাচনও। বর্তমান প্রতিবেদন সেই কলকাতার নির্বাচনকে নিয়েই।

কলকাতা পুরসভার (শহরের নয়) বয়স বিরানব্বই। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র হয়েছিলেন। ভারতীয় হিসেবে যে কোনো ব্যক্তির পরাধীন ভারতে সেই প্রথম স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ। বিত্তে-বৈভবে এবং জাঁকজমকে কলকাতা পুরসভা তখন এশিয়ার সেরা। নাগরিক পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ইত্যাদির নিরিখে এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা শহর টোকিও তখন কলকাতার চেয়ে অনেক পিছিয়ে। সেই বিত্তবান শহরের মেয়র হিসেবে দেশবন্ধু ইংরেজদের একচ্ছত্র আধিপত্যের দিকে অনেক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন। বৃটিশ প্রভুত্বের সৌধে ধরেছিল একটি বড়সড় ফাটল। ক্রমে ক্রমে কালের সরণি বেয়ে দেশবন্ধুর ছেড়ে যাওয়া সেই আসনে একে একে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এককালের মহান জাতীয়তাবাদী নেতাদের দ্বারা অলংকৃত সেই আসনে দীর্ঘদিন কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা অধিষ্ঠিত হননি। কোনো প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দলও দীর্ঘদিন পারেনি সেই আসনের কাছাকাছি পৌঁছতে। দীর্ঘ কয়েক দশকের ব্যবধানে এবারে বিজেপি কিছুটা আশা জাগিয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। সেই আশা কতটা বাস্তবসম্মত, কতটা কুহক তা নিয়েই এবারের প্রতিবেদন।

ওয়ার্ড নং	বিজেপি এগিয়ে
৮৭	১৫০০ (ভোটে)
২৫	৪০০০ (ভোটে)
৭০	৪০০০ (ভোটে)
৪৫	১৫০০ (ভোটে)
৩১	২২২০ (ভোটে)
৫২	১৫০০ (ভোটে)
৪৭	১২০০ (ভোটে)
২৩	৩৫০০ (ভোটে)
৮৬	১২০০ (ভোটে)

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ যা পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়েছে বিজেপিতে, সেই দল কোনো অনিবার্য কারণবশত কলকাতা পুরসভার ক্ষমতার কেন্দ্রের ধারে কাছে আসতে পারেনি কোনোদিন। কিন্তু ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি গোটা দেশের মতো কলকাতাতেও ভোটের জোয়ার তুলেছিল। কলকাতা পুরসভার

চিত্তরঞ্জন দাস

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সুভাষচন্দ্র বসু

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়

অন্তর্গত দুটো লোকসভা আসনের দুটিতেই দ্বিতীয় হয়েছিল বিজেপি। প্রাপ্ত ভোটার কলকাতা পুরসভা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মোট ২৫টি ওয়ার্ডে এগিয়ে আছে বিজেপি এবং তাদের মোট প্রাপ্ত ভোট ১৫ শতংশ। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ আশান্বিত হয় যে এবার পুরসভার নির্বাচনেও বিজেপি পঁচিশ বা তদূর্ধ্ব আসন পেয়ে মেয়র পদাসীন না হলেও মেয়র পদাসীন হওয়ার দিকে কিছুটা এগোবে। এবং ত্রিশঙ্কু পুরসভা হলে মেয়র পদ দখলও করতে পারে। সেই সম্ভাবনারই ওয়ার্ডভিত্তিক বিশ্লেষণ কিছুটা করা যাক।

লোকসভার নিরিখে বিজেপি-র এগিয়ে থাকা ওয়ার্ডে চালানো সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে বিজেপি-র সংগঠন তুলনায় দুর্বল (কিন্তু ব্যতিক্রম আছে) তবে সংগঠন ও নামনির্ভর তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান দুর্নীতি ও এককালের সংগঠন-ভিত্তিক দল সিপিএমের অতীতের অত্যাচার দেখে তিতিবিরক্ত মানুষ আজ আর সংগঠন নয়, চাইছে সত্যিকার কাজ। সেজন্যই এই দুইয়ের এক বিকল্প শক্তিকে তারা চায় আবাহন করতে। সেই বিকল্প শক্তি হিসেবে তারা বাতিল হতে চলা কংগ্রেসের বদলে ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ বিজেপিকেই বরণ করতে চায়। যেমন দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়া নিয়ে গঠিত ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড (কলকাতা পুরসভার একমাত্র ওয়ার্ড যেখানে কোনো বস্তি নেই)। বিজেপি-র সংগঠন বেশিরভাগ মানুষ যেখানে জানাচ্ছেন যে তাঁরা থাকবেন বিজেপি-র পক্ষেই। আবার উত্তর কলকাতার ব্যবসায়ী প্রধান ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা লোকসভার মতোই এবারও বিজেপি-র পাশেই, কারণ তৃণমূলের তোলাবাজি। ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডেও একই কারণে জনমত বিজেপিমুখী (অবশ্যই গোপনে) যদিও তৃণমুল কংগ্রেস এই জনমতের চ্যুতিকে বাঙালি-অবাঙালি বিভাজনে ফেলতে চায় যা ধোপে টেকে না। ৫২ নম্বর ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যাপারটা অনেকটা একই। তৃণমূলের পুরসভা ও রাজ্যসরকারের ব্যর্থতা ও পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য উদ্বেলিত করেছে তাদের। এখানেও তৃণমূল সামনে এনেছে বাঙালি অবাঙালি তত্ত্ব। মধ্য কলকাতার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবশ্য বিজেপির উত্থানের কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তৃণমূল ও কংগ্রেস কর্মীরাও। পার্শ্ববর্তী ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবশ্য জোর লড়াই-এর সম্ভাবনা স্বীকার করছেন সকলে। বিজেপি-র গতবার জেতা ২৩ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। সেখানে বিজেপি জয়ী হবে একরকম ধরেই নিয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে। বর্তমান কাউন্সিলার বিজেপি-র সুনীতা ঝাওয়ার তাঁর কাজের দ্বারা মন জয় করেছেন প্রায় সব ভোটারেরই। আবার ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডে জোর ধাক্কা খেয়েছে তৃমমূলের মা-মাটি-মানুষের ধারণা। দরিদ্র ভোটার অধ্যুষিত এই ওয়ার্ডেও হাওয়া এবার বিজেপির দিকেই।

সারণী দেখলেই বোঝা যাবে উপরিউল্লিখিত ওয়ার্ডগুলিতে বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে এগিয়েছিল কত ভোটে।

তবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ ও নিজেদের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির জোরে নির্বাচনে ভাল ফল করা যায় না, তার সঙ্গে দরকার সংগঠন ও পরিকল্পিত প্রচার ও প্রার্থী বাছাই। বলতে দ্বিধা নেই, বিজেপি এসব ব্যাপারে অন্য দলগুলির চেয়ে কয়েক যোজন পিছিয়ে। তাই প্রচুর হাওয়া থাকলেও এবারের নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। ২৫ বা তার আশেপাশে আসন নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস যদি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের শক্তিহীনতার সুযোগে প্রচুর রিগিং করে তাহলে আলাদা ব্যাপার।

ভোট এবং তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতেই পারেন বিদগ্ধজনরা। তবে শেষ কথা বলে চিরকালই জনগণ। আর সেই জনগণ শেষ বিচারে কাকে দেন মসনদ তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত। ততদিন শুধুই অপেক্ষা।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

চিঠিপত্র

অরুণাচল

‘অরুণাচল নিয়ে চীনের আগ্রাসী মনোভাব--- সীমান্তে ছড়ানো হচ্ছে উত্তেজনার পারদ’ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের (স্বস্তিকা ১৬ মার্চ সংখ্যা) প্রতিবেদন প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই।

কমিউনিস্টরা খুব নির্মম হয়। ইতিহাস তার প্রচুর প্রমাণ মজুত রেখেছে। কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করার অসংখ্য নজির আছে। কমিউনিস্ট আদর্শ শুধুমাত্র আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকাই নয়, আগ্রাসন চালিয়ে প্রতিবেশী দেশ দখল করাও তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। ভারতের বন্ধুত্বের প্রতিদানে ভারতকে ধ্বংস করা চীনের একমাত্র লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা। গত অর্ধ শতক যাবৎ তার অসংখ্য প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় নেতৃত্ব কেন তা বুঝতে পারছে না সেটাও কম বিস্ময়কর নয়। শত্রুর পেট ভরিয়ে শক্তির যোগান দিয়ে কখনো শত্রুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই সত্যটি বুঝতে হবে।

চীনকে ভারতের বাজার বন্ধ করার হুমকি দিলেই চীন ভারতের বিরুদ্ধে অপকর্ম করার সাহস দেখাবে না। ভারতের উচিত দূরের দেশগুলিকে ভারতে বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়া কারণ দূরবর্তী কোনো দেশের শক্তি বাড়লে তাতে ভারতের আশঙ্কার কারণ থাকে না। কিন্তু প্রতিবেশী যদি অপ্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার করে, তা হলে সেই প্রতিবেশীর আর্থিক শক্তি বাড়ানোয় বিপদ অনেক। এই সহজ সত্যটি বুঝতে হবে। সরল বিশ্বাস, সনাতন ধর্মের শান্তির বাণী, নির্বোধ উদাসীনতাই বিগত ১০০০ বছর ধরে ভারতবাসীর সর্বনাশ করেছিল বিদেশি শক্তি; সেই চক্রান্ত এখনো চলছে তবে ধীর গতিতে এবং সূক্ষ্মভাবে। তাই আমাদের চেতনা-যন্ত্রে ধরা পড়ে না। আমাদের চেতনা যন্ত্র উজ্জীবিত করা অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে, ঘরে আগুন লাগার পর কূপ খনন করতে গেলে কোনো উপকার হবে না।

—ভীতুশ্রী কলমকথক,
কল্যাণী, নদীয়া।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভারতীয়করণ

২০১৫ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং বেদ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনায় পদ্মবিভূষণ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন ইসরো প্রধান জি. মাধবন নায়ার এবং বিজ্ঞানী জয়ন্ত সহস্রবুদ্ধে দেরিতে হলেও সঠিক কথা বলেছেন। দেশীয় সংস্কৃতি-বিরোধী ডিরোজিওর কিছু হিন্দুছাত্র, মেকলে অনুগামী ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীগণ এই সত্যের জ্বালায় রে-রে করে সরব হয়েছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের গৈরিকীকরণ হচ্ছে বলে তাঁরা কলরব শুরু করেছেন। বিদেশি বিজ্ঞানীরা দেরিতে হলেও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে স্বীকার করছে। বিজ্ঞানী জেনারও বসন্তের টীকা আবিষ্কারের পিছনে গোয়ালিনীর অভিজ্ঞতাকে মান্যতা দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানী বা রাজনীতিবিদরা এর থেকে দূরে থেকেছেন। এঁরা সবকিছু ‘ব্যাদে আছে’ বলে ব্যঙ্গ করতে পিছপা হন না।

গ্রীস দেশীয় জ্যামিতিবিদ পীথাগোরাসের বিখ্যাত উপপাদ্যকে আমরা খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে বৌধায়নের শূন্য সূত্রে পাই। সূত্র দুটি হলো—

(১) সম চতুরস্রস্যাম্ময়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি—

সমচতুরস্র—শব্দের অর্থ বর্গক্ষেত্র এবং অম্ময়ারজ্জু— শব্দের অর্থ কর্ণ, সূত্রটির অর্থ বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মূল বর্গক্ষেত্রের (ক্ষেত্রফলের) দ্বিগুণ।

(২) দীর্ঘচতুরস্রস্যাম্মরজ্জু পার্শ্বমানী তির্য্যভমানী চ যৎ

পৃথগ্‌ভূতে করুস্তদুভয়ং করোতি।

দীর্ঘ চতুরস্র অর্থে আয়তক্ষেত্র, পার্শ্বমানী অর্থে দীর্ঘবাহু এবং তির্য্যভমানী অর্থে হ্রস্ব বাহু।

সূত্রটির অর্থ হলো— আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রটির দীর্ঘবাহু এবং হ্রস্ব বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের (দুটির যোগফলের) সমষ্টির সমান।

উপরিউক্ত তথ্যটি আমরা নিম্নোক্ত সূত্র থেকে পাই, যথা—

(১) বিজ্ঞানচর্চায় প্রাচীন ভারত ও সমকালীন অন্যান্য দেশ— সুধাংশু পাত্র। বাণীশিল্প প্রকাশন। পৃষ্ঠা-৬৩। (২) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস— ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ইনি রসায়নের অধ্যাপক। গান্ধীবাদী নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, চতুর্থসংস্করণ। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬। ড. ঘোষ এর মতে বিজ্ঞানী শ্রয়ভাব বিউরকের মতে পীথাগোরাস এই উপপাদ্যটি হিন্দুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। (৩) মর্তে অমর্ত বিজ্ঞান— নিরঞ্জন সিংহ, পৃষ্ঠা-৪৬, মডার্ন কলাম। ১৯৯৮ এপ্রিল প্রকাশকাল। (৪) গণিতশাস্ত্রে স্মরণীয় যাঁরা— প্রদীপ কুমার মজুমদার। পৃষ্ঠা-২১৯। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। কলকাতা-আগস্ট-১৯৯৫ প্রকাশকাল। (৫) The Science of the Sulba– By Dr. B.B.

তাই বিজ্ঞান কংগ্রেসে যে বিজ্ঞানের গৈরিকীকরণ করা হচ্ছে বলে প্রচার হচ্ছে তা সঠিক নয়। চেপে রাখা সত্যের প্রচারের এক বাস্তবসম্মত প্রয়াসমাত্র। তাই সব ‘ব্যাদে’ না থাকলেও সব ব্যাধির পিছনে বেদ আছে। চাই উদার মানসিকতা।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

কল্যব্দ ঃ হিন্দু কালগণনার একটি পদ্ধতি

ভারতে কালগণনার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে এবং ওই ঐতিহ্য চলে আসছে অতি প্রাচীনকাল থেকে। এই কালগণনার নাম কল্যব্দ অর্থাৎ যুগাব্দ। আজও পূজাপার্বণ,

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে যে সংকল্প-মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তাতে তিথি নক্ষত্র — কল্যাব্দ প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালগণনার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমগ্র দেশের যে কোনো অঞ্চলের জনগণ পূজা, বিবাহ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কলিযুগের কোন বৎসর, মাস, পক্ষ, দিন ও মুহূর্ত উল্লেখ থাকে। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালগণনার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমগ্র দেশের যে কোনো অঞ্চলের জনগণ পূজা, বিবাহ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কলিযুগের কোন বৎসর, মাস, পক্ষ, দিন ও মুহূর্ত উল্লেখ করে সংকল্প গ্রহণ করে। দীর্ঘকাল ধরে এই পরম্পরা চলে আসছে। বর্তমানে ৫০৯৭ কল্যাব্দ চলছে। এই অব্দের সূচনা হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহলীলা সংবরণের পর থেকে। মহাভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এর ৩৬ বছর আগে। তখন সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থান ছিল মঘা নক্ষত্রে। মহাভারতের মতে দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণেই হলো পাণ্ডবদের রাজত্বকাল। বরাহমিহিরের মতে শকাব্দের ২৫২৬ বছর আগে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেছিলেন। এর থেকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালের সময় দাঁড়ায় কলিযুগ শুরু হবার ৬৫৩ বছর পরে। আর মাত্র ১ বছর পর (আনুমানিক) কল্যব্দ নিরানব্বই শতাব্দীতে প্রবেশ করবে যা সারা দেশে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

আজ স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও আমরা ১ জানুয়ারিকে নববর্ষ ধরে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করি এবং সেই ক্যালেন্ডার বা অবৈজ্ঞানিক খৃষ্টীয় কালপঞ্জী বা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে চলেছি। এই ক্যালেন্ডারের বয়স মাত্র ২ হাজার বছর। ফলে লক্ষ লক্ষ বা কোটি বছরের কোনো সুপ্রাচীন ঘটনাকে এই কালপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। অথচ হিন্দু কালগণনা পদ্ধতিতে সাম্প্রতিক, প্রাচীন ও অতিপ্রাচীন ঘটনাবলীকে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

গুণগত বিচারে নয়, শুধুমাত্র ইংরেজ জাতির সামরিক সাফল্য এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

জাতি, ধর্ম ইত্যাদিকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে যদি কোনো আন্তর্জাতিক কালপঞ্জী মর্যাদা পাবার যোগ্য হয় তা হলো একমাত্র হিন্দু কালপঞ্জী।

গ্রেগরিয়ান পদ্ধতিতে আমরা সবেমাত্র একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি অথচ ভারতীয় কল্যাব্দ ৯৭তম শতাব্দীতে পদার্পণের ঘটনা আমাদের কজনেরই-বা জানা আছে?

—স্বপন দাশগুপ্ত,
শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২।

শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে শিক্ষাঙ্গনে একের পর এক নৈরাজ্যের ছবি ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে শাসকদলের শাখা সংগঠনগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা অব্যাহত আছে। অথচ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা অনেকটাই বজায় আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে রায়গঞ্জ, যাদবপুর, বিশ্বভারতীর পর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসক দলের শাখা সংগঠনগুলির বেপরোয়া মনোভাব ও অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাটাই বিপন্ন ও বিব্রত হয়ে পড়ছে। বাম শাসনে শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রার যেন পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে তৃণমূল শাসনেও। ছাত্রসংঘর্ষ, ঘেরাও, অবরোধ, শিক্ষক-অধ্যাপকদের হেনস্থা যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশেষ করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা গুণ্ডামি, মস্তানি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ পরিবারের আপনজনেরাও উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। এর আগে বামরাজত্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ক্লোজড্ সার্কিট টিভি বসানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা টানা দুদিন ব্যাপী উপাচার্য- সহ নানা পদাধিকারীদের ঘেরাও, কলকাতার হেরম্বচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের গায়ে পেট্রল ঢেলে দেওয়ার ঘটনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যের চরম হেনস্থার ঘটনা অনেকেরই স্মরণে আছে। আর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে দরজা বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা, দুজন মহিলা সিকিউরিটি অফিসারকে মারধর করা ও অধ্যাপিকাকে ধাক্কা মারার ঘটনার সাম্প্রতিকতম উদাহরণটি তৃণমূল রাজত্বে শিক্ষাজগতের কলঙ্কজনক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আসলে এস এস সি, পার্শ্বশিক্ষক, আংশিক সময়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনের ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

শিক্ষার পরিবেশে রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উপরও এর কু-প্রভাব পড়ছে।

কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা যেন রাজনীতির শিকার হয়ে যাচ্ছে। কলেজের অধ্যক্ষদের দেখলে মনে হয় যেন এঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নন, রাজনীতির দাদাদিদিদের দাসমাত্র। তাই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যক্কারজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকদলের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় অধ্যক্ষরা অনেকসময় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখাতে পারেন না। আবার এধরনের ঘটনায় পদ থেকে অপসারিত হন বা সরে যেতে বাধ্য হন।

শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেরই অনুভব করার সময় এসেছে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

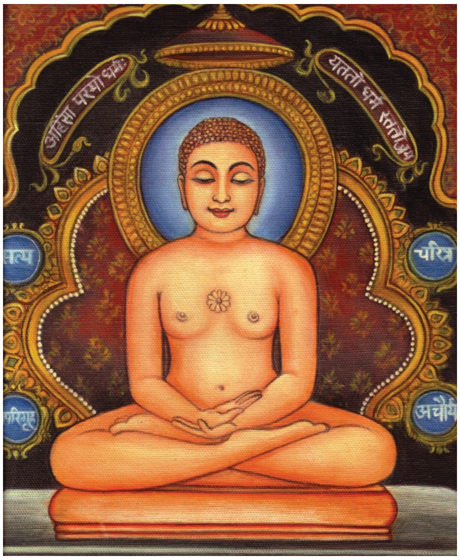

অহিংসার মূর্তিমান প্রতীক
ভগবান মহাবীর

বালমুকুন্দ প্রসাদ

পঞ্চশীল সিদ্ধান্তের প্রবর্তক এবং জৈনধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর অহিংসার মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন। যখন হিংসা, পশুবলি, জাতপাতের ভেদাভেদে ভারতীয় সমাজ জীবন দীর্ণ ছিল তখন তাঁর জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীকে সত্য ও অহিংসার মতো মৌলিক উপদেশের মাধ্যমে সঠিক পথ দেখানোর প্রচেষ্টা করেছেন। গল্পের মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। জৈন ধর্মের সংস্থাপক ছিলেন ঋষভদেব, কিন্তু ভগবান মহাবীর জৈনধর্মে আশানুরূপ সংশোধন করে ব্যাপকভাবে জনমানসে প্রচার করেন।

আজ থেকে আড়াই হাজারের বেশি আগে ভারতবর্ষ এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছিল। সামাজিক অসমতা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে মানুষ জর্জরিত ছিল। ধর্মের মূল উদ্দেশ্যে ভুলে গিয়ে জাতির সঙ্গে এক করে মানুষ পশুর স্তরে নেমে এসেছিল। বর্ণব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ ভুলে শুধু ঘৃণার পরিবেশ নির্মাণ হয়েছিল। যে নারীকে গৃহলক্ষ্মীর গরিমাপূর্ণ সম্মান দেওয়া হতো, যেখানে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো বিদুষীরা বেদের ঋক্ রচনা করেছিলেন, সেই নারীকেই পরাশ্রিতা, উপেক্ষিতা ও দাসত্বে আবদ্ধ করে ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা হতে শুরু হলো। শুধু তাই নয়, দাস প্রথার মতো নারী ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ালো।

রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও অস্থিরতার পরিবেশ দেখা যাচ্ছিল। শক্তিশালী রাজা দুর্বল রাজ্য আক্রমণ করে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করতে শুরু করেছিল। এরকম এক বিকট পরিস্থিতির মধ্যে ভগবান মহাবীরের জন্ম হয় ৫৯৯ খৃষ্টপূর্বাব্দের চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বিহারের বৈশালীর কাছে কুণ্ডল গ্রামে। পিতা লিচ্ছবি রাজবংশের রাজা সিদ্ধার্থ এবং মাতা ত্রিশলাদেবী। ত্রিশলাদেবীও অন্য এক রাজপরিবারের কন্যা ছিলেন। কথিত আছে, রাত্রিতে মহারানী ত্রিশলাদেবী ১৪টি শুভপ্রদ স্বপ্ন দেখেন। (১) মদোন্মত্ত হস্তী, (২) শ্বেত বৃষ, (৩) লক্ষ্মীদেবী, (৪) ২টি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পমালা, (৫) পূর্ণচন্দ্র, (৬) ধাবমান সিংহ, (৭) উদীয়মান সূর্য, (৮) জলপূর্ণ সুবর্ণ কলস, (৯) মহাধ্বজ, (১০) জলাশয়, (১১) সমুদ্র, (১২) দেব বিমান, (১৩) রত্নরাশি এবং (১৪) নির্ধূম অগ্নি। সকালেই রানী ত্রিশলাদেবী মহারাজার কাছে রাত্রদৃষ্ট স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে তার অর্থ জানতে চান। পণ্ডিত ও জ্যোতিষীরা জানান, মহারানীর গর্ভে এক দেবশিশু এসেছে, যে কালক্রমে তীর্থঙ্কর অথবা রাজচক্রবর্তী হবে।

জ্যোতিষীদের গণনানুসারেই চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীর মধ্য রাত্রিতে মাতা ত্রিশলা এক অনিন্দ্যসুন্দর দেবশিশুর জন্ম দেন। যখন এই শিশু মায়ের গর্ভে আসে তখন থেকে রাজ্যে সমৃদ্ধির লক্ষণ শুরু হয়। সবদিক বিবেচনা করে পুত্রের নাম রাখা হয় বর্ধমান। পরবর্তীতে রাজদম্পতি আরো এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তান লাভ করেন। পুত্রের নাম রাখেন নন্দীবর্ধন ও কন্যার নাম সুদর্শনা। শিশুকাল থেকে বর্ধমান তেজস্বী, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ছিলেন। বাল্যকালে খেলার সময় এক বিষধর সাপ এসে পড়ায় তার ছোট বন্ধুরা ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লে বর্ধমান একটুও ভয় না পেয়ে নিমেষের মধ্যে সাপের লেজ ধরে দূরে ফেলে দেয়।

যৌবনপ্রাপ্ত হলে পিতা-মাতা এক মহাপরাক্রমী সামন্ত রাজার কন্যা যশোদার সঙ্গে বর্ধমানের বিয়ে দেন। কালান্তরে তিনি এক কন্যাসন্তানের পিতা হন। কন্যার নাম রেখেছিলেন প্রিয়দর্শনা। ২৮ বছর বয়সে বর্ধমানের পিতা-মাতার দেহাবসান হয়। এই সময় তাঁর মনে প্রবল বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। ৩০ বছর বয়সে পার্থিব জগতের সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে দীক্ষা গ্রহণ করার সংকল্প নেন। এক শুভ মুহূর্তে তিনি রাজবেশ ও আভরণ ত্যাগ করে পূর্বাভিমুখে সিদ্ধ প্রভুকে প্রণাম করে প্রতিজ্ঞা করেন- ''আমি সমভাব সাধনা গ্রহণ করছি। আজ থেকে কায়মনোবাক্যে সমস্ত খারাপ আচরণ ত্যাগ করলাম। পূর্বকৃত পাপ আচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং আগামীতে ভাল কাজের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলাম। আমি যে কোনো পরিস্থিতিতে সমভাব থাকবো, যে কোনো

প্রকার কষ্ট, ভয়, বিপদকে সমভাবপূর্বক সহ্য করবো। আমি অবিচলিত মনে সাধনার এই আগ্নেয়পথে এগিয়ে যাব।”

বর্ধমান অদম্য সাহস, অপরাজেয় সঙ্কল্প এবং আত্মবলের সাহায্যে সাধনায় লেগে রইলেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় সমস্ত কষ্ট তিনি সহ্য করতে লাগলেন। অবশেষে কঠোর তপস্যায় ঋজুপালিকা নদীর তীরে শালবৃক্ষের নীচে তিনি ‘কৈবল্য জ্ঞান’ (সর্বোচ্চ জ্ঞান) প্রাপ্ত হন। এজন্য তিনি ‘কেবলিন’ নামে পরিচিত হয়। ইন্দ্রিয়কে বশ করার জন্য ‘জিন’ এবং পরাক্রমের জন্য ‘মহাবীর’ নামে তিনি বিখ্যাত হন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি তাঁর উপলব্ধির দ্বারা লোকশিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে শুরু করেন। প্রবাসকালে তিনি কখনো নির্জন কুটিরে, ধর্মশালায়, কামারশালায়, শ্মশানে অথবা বৃক্ষতলে রাত্রিবাস করেন। সহজ-সরল উপদেশ ও সংযমী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে।

ভগবান মহাবীর শ্রমণদের জন্য পাঁচ মহাব্রত এবং শ্রাবকদের জন্য পাঁচ অনুব্রতের ব্যবস্থা দিয়েছেন। পাঁচ মহাব্রত হলো— অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। পাঁচ অনুব্রত হলো— এক দেশীয় অহিংসা, একদেশীয় সত্য, একদেশীয় অচৌর্য, এক দেশীয় সদা-সন্তোষ এবং একদেশীয় ইচ্ছা-পরিমাণ। তাঁর উপদেশের মূল কথা—

• এই সৃষ্টি শূন্য নয়, সত্য। পদার্থ সতত পরিবর্তনশীল ও ক্ষয়শীল। জীব, অজীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল— এই ছ’টি দ্রব্য এবং জগৎ এগুলিরই অংশস্বরূপ।

• আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। আত্মা শরীর থেকে আলাদা। আত্মা চেতন, নিত্য ও অবিনাশী।

• কর্ম জড়-স্বরূপ। চেতন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জড় কর্মে পরিণত হয়। আত্মার পরিণামে শুভ, অশুভ ভাবের উদয় হয়। কর্ম অনুসারে ফল লাভ হয়। জীবের সুখ-দুঃখ কর্ম অনুসারেই হয়।

• যেমন কর্ম বন্ধনের কারণে আশক্তি সৃষ্টি হয় এবং কর্মফল ত্যাগে নিবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

• কর্মবন্ধনের জন্য আসক্তি জন্মায় এবং কর্মের ফল ত্যাগে নিবৃত্তি উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ কর্মবন্ধন থাকবে সংসার আসক্তি দূর হবে না। জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতেই থাকবে।

• আত্মার স্বরূপে স্থিতি হলেই সিদ্ধিলাভ হয় এবং তার ফলেই মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

চাতুর্মাস্যর কার্তিকীকৃষ্ণা অমবস্যার শেষ প্রহরে ৫২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিহারের নালন্দা জেলার পাওয়াপুরীতে ভগবান মহাবীর ইহলীলা সংবরণ করেন। মহাপুরুষ হাজার হাজার বছরের মধ্যে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীকে ধন্য করেন। ভগবান মহাবীর এমনই এক তেজস্বী মহাপুরুষ ছিলেন যিনি তাঁর সুকৃতির দ্বারা যুগ যুগ ব্যাপী মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি অহিংসা, অপরিগ্রহ ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা সাধারণ মানুষকে আলোকিত করে নিজেই এক আলোকস্তম্ভে পরিণত হয়েছেন। তাই মহানির্বাণের তিথিতে সেই আলোকপুরুষকে আলো দিয়েই বরণ করেন জৈনধর্মাবলম্বীরা।

(মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত)

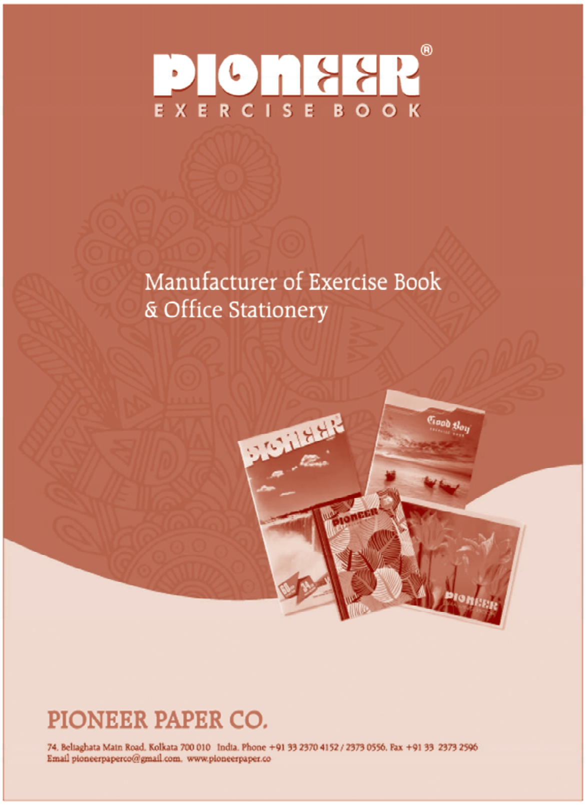

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

• Low Cost readymade Latrine (Toilet) • Low Cost House • Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant • Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016

98311 85740, 98312 72657,Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

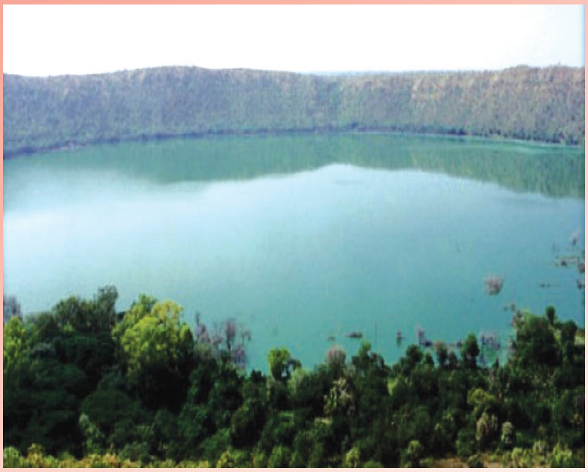

‘লোনার’ এক ভূতত্ত্বীয় ঐতিহ্য

সৌমেন নিয়োগী

মহারাষ্ট্রের বুলঢানা জেলার অন্তর্গত লোনার নামক একটি ছোট জনপদ। নৈসর্গিকতায় সমৃদ্ধ। মহাজাগতিক সংঘর্ষের ফলে প্রকাণ্ড উল্কার বিস্ফোরণে সৃষ্ট পৃথিবীর মধ্যে সৃষ্ট ক্রেটারগুলির মধ্যে অন্যতম লোনার ক্রেটার। সুতরাং ভারতীয় ভূখণ্ডে ভূতত্ত্বের বৈচিত্রের বিশালতায় ‘লোনার ক্রেটার’ (Lonar Crater) অতিশয় একটি উল্লেখযোগ্য ভূতত্ত্বীয় ঐতিহ্য। দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত এই ক্রেটারটি কেবলমাত্র সাধারণ পর্যটকদের উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু নয়, রয়েছে পরিবেশবিদ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, গবেষকদেরও এবং তার সঙ্গে সহস্রাব্দী প্রাচীন লোককথা ও স্থান ঐতিহ্যের এক অমোঘ গরিমা। ক্রেটার বলতে সাধারণভাবে আগ্নেয়গিরি মুখকে বোঝায় এবং সেই ভাবে বহুদিন ধরেই ভূতত্ত্ববিদরা এই লোনার ক্রেটারটিকে তার পূর্ণ গোলাকার আকৃতির জন্যই মনে করতেন। কিন্তু বর্তমানে সাম্প্রতিক উন্নত গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, আজ থেকে আনুমানিক ৫০ হাজার বছর পূর্বে অতিবেগে ধেয়ে আসা এক প্রকাণ্ড (আকারে প্রায় ২ মিলিয়ন টন ভর সম্পন্ন) এক উল্কার প্রবলভাবে আছড়ে পড়ার ফলে সৃষ্ট হয় এই ক্রেটার। কারণ দাক্ষিণাত্যের যে আগ্নেয়গিরির দ্বারা উৎপন্ন ভূস্তর তার বয়স প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর পুরোনো যা ভূতত্ত্বীয় সময় সারণীতে মেলে না। বরং ক্রেটার সংলগ্ন স্থানের সিলিকা-বিশিষ্ট কাঁচ জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় যা সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উৎপন্ন তাপের ফলেই এরূপ এক আচ্ছাদনের সৃষ্টি করতে পেরেছে।

"The presence 'plagioclase' that has been either converted into the 'maskelynite' or contains planer deformation features has confirmed the impact origin of this crater. The presence of shatter cones, impact deformation of basalt layers comprising its rim, shocked 'breccia' inside the crater, and non-volcanic ejecta blanket surrounding the crater are the further proof of the impact origin of Lonar Crater."

পৃথিবীর বুকে অসংখ্য উল্কাবৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন স্থানে, যার ফলে বিভিন্ন আকৃতির ক্রেটার সৃষ্টি হয়েছে যাদের আকৃতি ৫ মিটার ব্যাস থেকে ৩০০ কিলোমিটার ব্যাস পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। লোনার সেই তুলনায় অতি সাধারণ ১.৮৩ কিলোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি ক্রেটার যার গভীরতা হলো ১৫০ মিটার এবং সর্বোপরি পৃথিবীস্থিত ৫টি বৃহৎ ক্রেটারের মধ্যে অন্যতম বেসাল্ট পাথরে সৃষ্ট হওয়া একমাত্র ক্রেটার যা পূর্ণভাবে গোলাকার এবং তার মধ্যে সৃষ্ট লেকটির জল সমুদ্রের জলের অপেক্ষায় ৯ গুণ লবণাক্ত এবং যাকে কেন্দ্র করে রয়েছে জীব জৈব জগতের বৈচিত্র্যের সমাহার ও মনুষ্যবসতির ক্রমবর্ধমান এক ঐতিহ্য যা এক কথায় এই স্থানটিকে দুর্লভ করতে অতিশয় সক্ষম হয়েছে।

লোনার ক্রেটার সংলগ্ন এলাকাটি পুরাতত্ত্বের দিক দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রয়েছে বহু প্রাচীন মন্দির ও লোককথা যার অন্তরালে রয়েছে স্থানটির ইতিহাস। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জনৈক এক ইংরেজ অফিসার J.E. Alexander এটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু ক্রেটার ও তাঁর কেন্দ্রস্থ লেকটির উল্লেখ আমরা বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাই। যেমন স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণে পঞ্চসর, কালিদাসের রঘুবংশম্-এ। পরবর্তী মুগল আমলে আইনি আকবরিতে ক্রেটার ও লেককে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে হেমাদপন্তী নির্মাণ শৈলীতে বিভিন্ন মন্দির যেমন, শঙ্কর গণেশ মন্দির। ওয়াঘ মহাদেব মন্দির, অম্বর খনা-সূর্য মন্দির, দৈত্যসূদন শুক্রাচার্যের মানমন্দির, সীতানাহানি কুমারেশ্বর শিব মন্দির ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে বিশেষ হলো স্বচ্ছ জলের ধারা গোমুখ মন্দির যা ক্রেটারের বহির্পরিধিতে অবস্থিত। এছাড়া আছে (Geo magnetic) পাথর শিলারূপে পূজিত চুম্বকীয় মারুতি।

পুরাণ অনুসারে লোনাসুর নামক দৈত্যের আবাসস্থল ছিল এই স্থানটি। ভগবান বিষ্ণু জীব রক্ষার্থে লোনাসুরকে বধ করেন। এই পুরাণের বর্ণনায় অনুপ্রাণিত হয়ে চালুক্য বংশীয় এক রাজা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন দৈত্যসূদন মন্দির, অনবদ্য শিল্পকলায় সমৃদ্ধ মন্দিরটি এখনো একটি বিস্ময়।

লোনার ক্রেটারের লেকের জল অতিশয় লবণাক্ত হওয়া সৃষ্ট হয়েছে এক অদ্ভুত ধরনের জীব বৈচিত্র এবং এর জলে পাওয়া গেছে Sprilluna নামক শৈবাল এবং বিভিন্ন প্রকার অদ্ভুত সব ব্যাক্টেরিয়া যা মিথেন ও বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্রিন হাউস গ্যাস শোষণ করতে সক্ষম।

সুতরাং লোনার ক্রেটার ও কেন্দ্রস্থ লেকটি ভূতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদবিদ ও জীব বৈজ্ঞানিক, পুণ্যার্থী পর্যটক ও প্রকৃতি-প্রেমীর কাছে সত্যই এক অপার্থিব দর্শনীয় স্থান।

নবাঙ্কুর

নিজের গ্রাম ও দিলীপ

কৌশিক গুহ

গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বলে সবসময় স্কুলের কথা বলেন দিলীপ মিশ্র। ছোট স্কুল থেকে বড় স্কুল। তারপর কলেজ। সাধারণ কলেজ থেকে মেডিক্যাল কলেজ। ধাপে ধাপে এগিয়েছে পড়াশোনা। বাবার কাছে পরামর্শ শুনেছিলেন ছোটবেলা থেকে, ‘লেখাপড়ার মতো জিনিস হয় না। পড়াশোনা করতে হয় সারাজীবন। আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের মাথা উঁচু করে এগোবার জন্যে চাই পড়াশোনা।’ দিলীপ কথাগুলো মনে রেখেছিলেন সারাজীবন। এখনও পড়ার অভ্যেস রয়েছে। বই কেনার জন্যে ছোটবেলায় পয়সা জমাতেন। এখনও প্রতিবছর কয়েক হাজার টাকার বই কেনেন। অন্যদের পড়তে উৎসাহ দেন সবসময়। পড়াশোনাই তাঁকে এগিয়ে দিয়েছে জীবনের পথ। মা বলতেন, ‘যখন তোর নামডাক আর আয় ভালো হবে তখন গ্রামের লোকদের জন্যে কিছু করিস।’ শহরে বসবাস করলেও গ্রামের সঙ্গে রয়েছে ভালোমতোন যোগাযোগ। দিলীপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমূল্য রায়। একই পেশায় রয়েছেন। দুজনেরই ভালো নামডাক। চিকিৎসক ভালো। ব্যবহার ভালো। রোগীদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক। ছোটদের জন্যে মনে বিশেষ জায়গা রয়েছে। দিলীপ হাড়ের ডাক্তার। সাধারণ চিকিৎসাও করেন গ্রামে গেলে। দুটো গাড়ি নিয়ে রবিবার সকালে চলে যাওয়া। সারাদিন কাজকর্ম। রোগী দেখার জন্যে কারও কাছে পারিশ্রমিক নেন না। তাছাড়া নিজের সংগ্রহের সমস্ত ওষুধ বিনা পয়সায় দিয়ে দেন। আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে লোকজন আসে। অনেকে তাঁকে গ্রামের বিভিন্ন সংস্থায় যুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তিনি রাজি হননি। বলেন, ‘আমার বড় কাজ লোকের চিকিৎসা। সেটা নিয়ে ভাবি। অন্য দিকে মন দিতে পারবো না, উচিত নয়।’ সবাই জানেন, দিলীপ এক কথার মানুষ।

তবে দিলীপ গ্রামের সমস্ত ভালো কাজে অংশ নিয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন। গ্রামের ব্যাপারে মা ভাবতেন সিদ্ধান্ত নিতেন তাই-ই বিনা প্রশ্নে মেনে নিতেন দিলীপ। মা বললেন, ‘তুই বিদেশে পড়তে যাস না। এখানে থেকে যতটা পারিস পড়, কোনো আপত্তি নেই।’ সে কথা মেনেছেন দিলীপ। চিকিৎসাক্ষেত্রে নামডাক হয়েছে ডাক্তার হিসেবে। প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় পেশার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্যে। বইপত্র সংগ্রহ করেন নিয়মিত। বিদেশে না গেলেও মনের সবকটা জানালা খোলা রাখায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন খবর তাঁর কাছে এসেছে। মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক হিসেবে যুক্ত থাকায় নানা ধরনের রোগী দেখেছেন। রোগীদের সামাজিক, আর্থিক অবস্থা বুঝলে পেরেছেন ভালোভাবে। পাশাপাশি শিক্ষক হিসেবে বিদ্যাচর্চার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। লাইব্রেরিতে বসে পড়েছেন। কখনও কখনও বই বাড়ি নিয়ে গেছেন। ছাত্রদের বলতেন, ‘আমার বই কেনার ক্ষমতা ছিল না। লাইব্রেরিতেই তো পড়াশোনা করেছি।’

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র যাতে ঠিকমতো চলে সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। খোঁজ খবর নিয়েছেন। কিন্তু কখনও বলেননি, ‘এটা করো, ওটা করো।’ বরং বলেছেন, ‘গ্রামের মানুষরা গরিব। অনেক অসুবিধে থাকে তাদের, যতটা পারবে সাহায্য করবে। ডাক্তারবাবুকে গ্রামের মানুষরা কখনও অশ্রদ্ধা করে না। শ্রদ্ধাটা যেন বজায় থাকে। তোমাদেরও দাঁড়াতে হবে আন্তরিকতা নিয়ে তাদের পাশে।’ নবীন চিকিৎসকরা উৎসাহিত হন তাঁর কথায়।

দিলীপ বলেছেন, ‘গ্রামের স্কুল স্বাস্থ্যকেন্দ্র লাইব্রেরি ঠিকমতো রাখা দরকার। আটচালায় গ্রামের মানুষ জড়ো হবে। নানা বিষয়ে আলোচনা করবে। পরনিন্দা পরচর্চা কম হবে। গ্রাম কল্যাণের ভাবনা থাকবে। গ্রামের অনেক বাড়ির ছেলেমেয়ে নানান দায়িত্ব নিয়ে বাইরে কাজ করছে, বললেই সানন্দে সহযোগিতা করবে। নিজেদের গ্রামের উন্নতির জন্যে ভাবতে হবে আমাদেরই।’

গ্রাম সম্পর্কে দিলীপ বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। এই গ্রাম তাঁকে গড়ে দিয়েছে। এই গ্রামের মাটিতে কেটেছে শৈশব কৈশোর। গ্রাম থেকে শহরে গেছেন পড়তে। ঠাকুমা বলেছিলেন, পড়াশোনা করে গাঁয়ের কথা ভাবিস। গাঁয়ের মানুষদের কথা মনে রাখবি।’

দিলীপ এখন গ্রামে গিয়ে ঠাকুমার ছবির নিচে দাঁড়িয়ে বলে, ‘তোমার দিলীপ আগের মতোই আছে।’ ঠাকুমা শুধু আগের মতো থুতনি ধরে চুমো খেতে পারে না।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

আশপাশে

বেড়াতে যাওয়ার আগে

নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে দেবাদৃতা ভাবছিল এবার কি কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে না? তার ভাবনা দানা বাঁধতে না বাঁধতেই বাবা জানাল চার দিনের জন্যে পুরী যাওয়া হবে। দলে কে কে থাকবে? বাবা মা দাদা যাচ্ছে। পিসি পিসেমশাই এক কথায় রাজি। পিসতুতো দাদা মানে দাদাভাই যাবে না। সে নতুন চাকরি পেয়েছে অন্য রাজ্যে। দেবাদৃতার দাদা এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এখন ছুটি। দেবাদৃতা ক্লাস ফাইভে উঠল। ভাইবোনে যেমন ঝগড়া তেমনি ভাব। পিসি বলে, 'আমরা দুই ভাইবোন যখন ছোট ছিলাম কখনও ঝগড়া করতাম না।' দাদা বলে, 'তুমি আর বাবা ছিলে গুড গার্ল গুড বয়। আমরা দুজন ব্যাড বয় আর ব্যাড গার্ল।' পিসি বলে, 'তা নয়। তবে ঝগড়া না করলেই ভালো।' দেবাদৃতার দাদা সপ্তর্ষি এখন ভালো ছবি তোলে। সে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। গরমের দিনে বেড়াতে গেলে বেশি জিনিস লাগে না। দেবাদৃতা ঠিক করেছে ছবি আঁকবে আর লিখবে। আঁকার জিনিসপত্র নোটবুক কলম নিল। ওর একটা বাইনোকুলার আছে, বেশ জোরালো। সেটা নিতে ভুলল না। আগে কয়েকবার বেড়াতে গেছে দাদু ঠাকুমাকে নিয়ে। দুজনেই নেই। ঠাকুমা চলে গেছে বেশ কয়েক বছর আগে। গত বছর দাদু চলে গেছে। বেড়িয়ে ফেরার পর দাদু শুনতে চাইত সব কথা। দেবাদৃতা এবার কাকে বলবে? সে ঠিক করেছে নিজের আনন্দে ছবি আঁকবে লিখবে। ভ্রমণের স্মৃতি ধরে রাখবে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার কি জন্যে দেওয়া হয়? প্রথম কে পান?

২. কোন্ পরিবারের তিনজন ভারতরত্ন সম্মান পেয়েছেন? তাঁদের নাম? কোন্ কোন্ বছর?

৩. ভারতরত্ন সম্মান কোন্ সাল থেকে দেওয়া শুরু? প্রথম কে পান?

৪. এন সি সি-র পুরো রূপ কি? কবে প্রতিষ্ঠিত?

৫. সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কোথায় রয়েছে? কাজ কি? 'সাহা' কে?

উত্তর : ১. চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে। দেবিকা রানী রোয়েরিখ। ২. নেহরু পরিবার। জওহরলাল, ইন্দিরা, রাজীব। ১৯৫৫, ১৯৭৯, ১৯৯১। ৩. ১৯৫৪। সর্বো পল্লী রাধাকৃষ্ণন। ৪. ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর। ১৯৪৮। ৫. কলকাতায়। পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাকেন্দ্র। মেঘনাদ সাহা।

ফিরে পড়া

ভারত-সংগীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৪৯-১৯২৫)

চল রে চল সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ-গর্বে
সাধ রে সাধ সবে দেশের কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য
কে করে মোচন?
উঠো জাগো, সবে বলো, মা গো!
তবে পদে সঁপিনু পরান।
এক তন্ত্রে করো তপ,
এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা-দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাওরে আনতে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাওরে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন করো দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান,
এক পথে এক সাথে চলো
উড়াইয়া একতা-নিশান।

নারীশক্তি জাগরণে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি

নমি সরকার

নারীশক্তি জাগরণে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি আজ সারা ভারতে একটি পরিচিত নাম। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা বসবাস করছেন সেখানেও সমিতি প্রভাবী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতীয় নারীকে মাতৃত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব— এই তিন আদর্শে উজ্জীবিত করে আদর্শ নারী সমাজে পরিণত করাই সমিতির মূল লক্ষ্য। আর সেজন্য সেবিকাদের সামনে আদর্শ হিসেবে রাখা হয়েছে তিনজন ঐতিহাসিক মহীয়সী নারীচরিত্রকে। এঁরা হলেন মাতৃত্বের আদর্শ স্বরূপা রাজমাতা জীজাবাঈ, নেতৃত্বের আদর্শ স্বরূপা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ এবং কর্তৃত্বের আদর্শ স্বরূপা ইন্দোরের মহারানী দেবী অহল্যাবাঈ হোলকর।

রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীবাঈ কেলকর মহারাষ্ট্রের নাগপুরের একজন সাধারণ গৃহবধূ। ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এক দেশভক্ত পরিবারে। ছোটবেলায় মায়ের কাছে দেশপ্রেমের পাঠ শিখেছিলেন। বিয়ে হয়েছিল ওয়ার্ধার এক বনেদি পরিবারে। শ্বশুরবাড়ি এসে তিনি লক্ষ্য করেন আশেপাশের মহিলারা রান্নাঘর ও সন্তান পালন ছাড়া দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। পুরুষরা দেশের কথা ভাবছে, কিন্তু মেয়েদের সে বিষয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো। এরকম সময়ে তিনি একদিন সার্কাস দেখতে গিয়ে সার্কাস দলের ছোট ছোট মেয়েদের শারীরিক কলাকৌশল দেখে আশার আলো দেখতে পান। তিনি ভাবতে থাকেন, সমাজের সমস্ত মেয়েকে এরকম শারীরিকভাবে সক্ষম করে তুলতে পারলে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর তার ফলেই তারা নিজেদের অসহায়তা ও দুর্বলতা দূর করতে পারবে।

ঠিক এরকম সময়েই সংবাদপত্রের একটি ঘটনা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কলকাতায় স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণরত কুসুম নামে এক মহিলাকে কয়েকজন গুণ্ডা জোর করে তুলে নিয়ে যায়। স্বামী তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলে কুসুম আত্মহত্যা করে। সংবাদপত্রে এরকম খবর লক্ষ্মীবাঈ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন ও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠতেন। মেয়েদের এরকম চরম অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা। এ বিষয়ে কিছু একটা করার জন্য মনস্থির করে ফেলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর স্বামীর যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হয়। তখন তিনি দুই কন্যা ও ছয়পুত্রের জননী। ওয়ার্ধায় তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা জোর কদমে চলছে। তাঁর দুই পুত্রও নিয়মিত শাখায় যায়। বাড়িতেও তারা অনেক সময় ব্যায়াম ও লাঠি-ছুরি খেলা অভ্যাস করতো। তিনি বিশেষভাবে এসব লক্ষ্য করতেন। তাঁর মনে হলো, মেয়েদেরও যদি এসব অভ্যাস করানো যায় তাহলে তাদেরও শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়বে, তার ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর প্রেরণায় শুধুমাত্র মেয়েদের উন্নতিকল্পে ও মেয়েদের দ্বারাই ‘রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি’ মাত্র কয়েকজন বালিকাকে নিয়ে শুরু করেন। খুব শীঘ্র এই সংগঠন মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে থাকে। সেবিকারা শ্রদ্ধাভরে তাঁকে ‘মৌসিজী’ অর্থাৎ মাসি বলে সম্বোধন করেন।

সমিতির সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় অচিরেই সারা দেশে শাখা বিস্তারলাভ করে। ১৯৬৭ সালে মহারাষ্ট্রের মেয়ে বিমল রস্তোগী বিবাহসূত্রে কলকাতায় এসে সমিতির শাখা শুরু করেন। এখানে তাঁর নাম হয় বাসন্তী বাপট। আজ তিনি ধরাধামে নেই, কিন্তু সমিতির শাখা আজ পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলায় পৌঁছে গেছে। সমিতির পতাকাতলে হাজার হাজার বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া শারীরিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে লেগে রয়েছেন। আজ দেশের যে কোনো কাজে— ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিতে যাওয়া সৈনিকভাইদের কপালে মঙ্গলতিলক এঁকে দিয়ে খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া অথবা আহত জওয়ান ভাইদের জন্য রক্ত দেওয়া কিংবা কার্গিলের যুদ্ধে সৈনিক ভাইদের জন্য হাত ও পায়ের মোজা তৈরি করে দেওয়াই হোক না কেন— অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। তাছাড়াও যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও সমান ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বর্তমানে মেয়েদের উন্নতিকল্পে নানারকম ভাষণ, আলোচনাচক্র প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু নীরবে, নিভৃতে নারী জাগরণের কাজ করে চলেছে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। কোনো প্রচার নেই, লোক দেখানো হৈচৈ নেই--- একটাই সাধনা ভারতের নারী সমাজকে সত্যিকারের ভারতকন্যা তৈরি করা। দেশের কোণে কোণে আজ লক্ষ লক্ষ সেবিকা গৈরিক পতাকার সামনে বুকে হাত রেখে সংকল্প গ্রহণ করছে—

‘নমামো বয়ং মাতৃভূঃ পুণ্যভূস্ত্বাম্
ত্বয়াবর্ধিতা সংস্কৃতাস্ত্বৎসুতাঃ।
অয়ে বৎসলে মঙ্গলে হিন্দুভূমে
স্বয়ং জীবিতান্যপায়মিস্ত্বায়।।’

জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের ঘটনা প্রবাহকে অস্বীকার করলে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে আমরাই সকলের থেকে আলাদা, এমন একটা ধারণা শুধু আমাদেরই একচেটিয়া। চলতি জনপ্রিয় উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো একটি দেশ, সমাজ, আন্দোলন বা একটি নির্দিষ্ট কালপর্ব তার আপন বৈশিষ্ট্যে একেবারে ভিন্ন মাত্রার হতেই পারে, তাই চলতি নিয়ম-কানুন বা প্রচলিত নীতির সঙ্গে মান্যতা রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা তার নাও থাকতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশ বা রাষ্ট্র তা সে ছোট হোক বা বড় অনেক সময়ই বিশ্বাস করে এসেছে যে তারা গুণগতভাবে অন্য দেশের থেকে একেবারে আলাদা। তবুও মনুষ্য সমাজের মধ্যে অনেক সময়ই একটি অন্তর্লীন সাযুজ্য লক্ষ্য করা গেছে। যেমন ধরুন যে কোনো দেশই বন্যা বিধ্বস্ত হতে পারে। সে সময় অনেক দেশেই একই রকম প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। এর অর্থ একটাই, একজনের পরিস্থিতি দেখে আর একটি দেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিতে পেরেছে। এই পটভূমিতেই আমাদের বিচার করতে হবে বহু বিতর্কিত জমি অধিগ্রহণ বিলের বিষয়টি। এটা বিশেষভাবে জানা দরকার আমাদের এখানে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মালিকের মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক কিনা তা নিয়ে যে ধুন্দুমার রাজনীতি চলেছে, যেখানে বিশ্বের ধনী ও বৃহত্তম দু'টি দেশ আমেরিকা ও চীন যাদের আবার শাসন প্রণালীও সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার, সেখানে জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মালিকের মতামত আদৌ বাধ্যতামূলক নয়। শাসন প্রণালীর এমন বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে একই নীতির অনুসরণ কিন্তু আমাদের দেশে চলা বিতর্কের মূলে নিয়ে যায়। আমাদের দেশের আইন প্রণেতারা কি সত্যিই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তববাদী নীতি প্রণয়নে উৎসাহি নাকি একে অপরের বিরুদ্ধে আঁচড়া-আঁচড়ি করে কে জিতল তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর?

> ১৯৫১ সালে বড় বড় বাঁধ, ইস্পাত কারখানা ইত্যাদির জন্য সরকার যে ব্যাপক জমি অধিগ্রহণ করেছিল তার কিছু ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এখনও বিতর্কিত হয়ে আছে। তবে এটিকে আঁকড়ে ধরে অতীতে কী হয়নি সেই দিকে তাকিয়ে না থেকে কী পদ্ধতিতে পৃথিবী ব্যাপী কর্মকাণ্ড চলেছে সেদিকে নজর ঘোরালেই আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করব।

এখন মানবার সময় এসেছে যে দেশের কৃষি ব্যবস্থায় যথেষ্ট সংস্কার জরুরি এবং তা করা গেলেও কি অদূর ভবিষ্যতে দেশের ৬০ শতাংশ লোককে কৃষিক্ষেত্রে যথাযথ জীবন ধারণের গ্যারান্টি দিতে পারবে? আর আমাদের কৃষকদের ছেলেমেয়েরা কি আজীবন এই কৃষক জীবনযাপনই করবে এবং দেশের শহরাঞ্চলগুলির নানান সুযোগ সুবিধে থেকে বরাবর বঞ্চিতই থেকে যাবে? চাষের জমি কিন্তু ক্রমাগত খণ্ড বিখণ্ড অর্থে শরিকে ভাগ হতে হতে প্রান্তসীমায় পৌঁছনোর পথে। আর তার থেকেও মারাত্মক প্রশ্নটি হলো আমরা সত্যিই জাতিগতভাবে বিশ্বাস করি কি কেবলমাত্র উৎপাদন ও পরিষেবা শিল্পেই লক্ষ লক্ষ চাকরি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে?

গত ১ বছর ধরে বাগাড়ম্বরের পর যে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও সেটেলমেন্ট (এল এ এ আর) বিল তৈরি হয়েছিল তার সব চেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিল দু'টি। প্রথম জমিদাতাদের সম্মতি, দ্বিতীয় তাঁদের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য যারা সেই অধিগৃহীত জমির কাজে নিয়োজিত তাদের পাওনা। এর আগে পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলবৎ থাকা বৃটিশ আইন বলে বহু সময়ই কৃষকের জমির ন্যায্য পাওনার বদলে যে কোনো মর্জিমাফিক দামে অধিগৃহীত হয়ে যেত। এখন জমি মালিকদের কত

শতাংশের সম্মতি ব্যতীত কোনো জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবে এই নিয়ে পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র ও তীব্র বিতর্কের ঢেউ তুলেছে। একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীগোষ্ঠী এই শতাংশের বিচারে যে প্রস্তাবনা দিয়েছিল পরে তাকে আদতে নীচু ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী প্রতিপন্ন করতে তাদের সুপারিশগুলি এক আঁচড়ে নাকচ করে জমি মালিকের সম্মতি সরকারি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। আবার তফশিলভুক্ত অঞ্চলগুলিতে এই কড়াকড়ি এমন করা হয় যেখানে একটি বড় অঞ্চল অধিগৃহীত হলে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ পঞ্চায়েতের মতামতের জায়গায় যে কোনো একজন পঞ্চায়েত প্রধানই্ গোটা প্রস্তাবটিকে বাতিল করে দিতে পারে।

মজার কথা, এই আইন করার সময়েই গরিষ্ঠাংশ বুঝতে পেরেছিলেন এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। আইন প্রণনয়নের পর থেকে গত মাসগুলিতে সেই আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। তাই আজকে যাঁরা নতুন বিলটির বিরোধিতা করছেন তাঁরাও ব্যক্তিগত স্তরে আগের বিলটির অকার্যকারিতা স্বীকার করছেন। আমরা কখনই অন্ধভাবে অন্যদেশের অনুকরণ করব না। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে তার প্রয়োগযোগ্যতাও বিচার করব। আমরা সেটাই করছি। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় চীনের ক্ষেত্রে 'পাবলিক পারপাজ' কথাটি অর্থহীন, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। আবার আমেরিকার ক্ষেত্রে বহু সময় ব্যক্তি-উদ্যোগে উন্নয়ন আদতে সরকারি বা জনগণের উদ্যোগ বলে গণ্য হয়। আমরা সরকারি-বেসরকারি কঠিন মেরুকরণ মেনে চলি। আমেরিকার আইনে এটুকুই শুধু বলা আছে যে জমি অধিগ্রহণ করলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিলেই হবে। এর বেশি কিছু নয়। আমাদের পূর্বোল্লোখিত এল এ এ আর বিশদে নিদিষ্ট ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা করেছে।

মজার কথা, বিলটি নিয়ে তুমুল বিক্ষোভের প্রথমপর্বে হঠাৎই শোনা গেল ক্ষতিপূরণের অংশটি নতুন বিলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রচারটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে করা হয়েছিল কিনা বোঝাবার আগেই এটা বোঝা গিয়েছিল প্রচারটি সর্বৈব মিথ্যা। তারপর থেকেই কিন্তু বিতর্ক জমিদাতার সম্মতি ও অন্যান্য পদ্ধতিগত বিষয়ের দিকে সরে গেছে। ভাবলে স্তম্ভিত হতে হবে ২০১৩-র আইনে নির্দিষ্ট জমির ক্ষেত্রে যে জরিপ, প্রথা পদ্ধতি ও চূড়ান্ত অনুমোদনের কথা বলা হয়েছে তাতে কোনো পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে হাত দিতে বা ছাড়পত্র পেতে কম করে ৫০ মাস লাগবে। এই সময়সীমা ধরা হয়েছে যদি সব স্তরের সম্মতি ও অনুমোদন ঘড়ির কাঁটার মতো সুশৃঙ্খলভাবে চলে। যে কোনো প্রতিষ্ঠান যাদের পরিকাঠামোগত প্রকল্প রূপায়ণের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানবেন এই পদ্ধতি নিশ্চিতভাবেই যে কোনো প্রকল্পকে গোল্লায় দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এখানে বলা প্রয়োজন এই ধরনের অন্তর্নিহিত সব নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা দেশে শিল্পায়নের যে কোনো প্রচেষ্টাকে আটকে দেওয়ার সপক্ষে প্রায় একটি দার্শনিক মতবাদের সমগোত্রীয় হতে পারে। কিন্তু দেশের যে লক্ষ লক্ষ ব্যাকুল তরুণ-তরুণীর জীবিকার জন্য প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ চাকরির সম্ভাবনা তৈরি করার তীব্র বাস্তব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেওয়ার মহামন্ত্র। এই প্রসঙ্গেই গ্রীসের কথা উল্লেখ করছি, তারা দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত কোনো শৃঙ্খলা (fiscal discipline) বা প্রকরণ না মানায় আজ দেউলে হবার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। তাই সময়ের দাবিকে অস্বীকার করলে এবং অন্যের অভিজ্ঞতার শিক্ষা না নিলে আমরাও আত্মধ্বংসের পথে এগিয়ে যাব।

অবশ্যই যাঁরা যথার্থই ক্ষতিপূরণ বা জমি অধিগ্রহণের পর শিল্পায়ন হলে কত চাকরি হতে পারে এমন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সন্দিহান, তাদেরও পক্ষে কিছু যুক্তি অবশ্যই আছে। ১৯৫১ সালে বড় বড় বাঁধ, ইস্পাত কারখানা ইত্যাদির জন্য সরকার যে ব্যাপক জমি অধিগ্রহণ করেছিল তার কিছু ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এখনও বিতর্কিত হয়ে আছে। তবে এটিকে আঁকড়ে ধরে অতীতে কী হয়নি সেই দিকে তাকিয়ে না থেকে কী পদ্ধতিতে পৃথিবী ব্যাপী কর্মকাণ্ড চলেছে সেদিকে নজর ঘোরালেই আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করব। আর সেটাই প্রাগমাটিজম্ বা বাস্তববাদিতা। তবে ক্ষতিপূরণ সব থেকে দ্রুত ও কোনো লাল সুতোর ফাইলে যে আটকে থাকবে না সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যেন সর্বাধিক দ্রুততায় হয় এবং চাকরি যেন দেশবাসীর চোখে পড়ে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করে তা যেন এই সব চাকরিমুখী হয় সেটিও দেখতে হবে। এ বিষয়ে ব্যর্থতা, দীর্ঘসূত্রতা এলেই সবচেয়ে যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে ভারতের কৃষক।

(লেখক বিজেডি সাংসদ)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

দুর্গা ও কালীপূজায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ পুলিশি ফরমান

ইসলাম ধর্মে তো মূর্তিপূজা অধর্ম, তাদের ধর্মাচারের বিরোধী কাজে তারা যদি অংশ না নেয়? পুলিশ এরকম ক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার কোন উপায় করবেন?

শূলপাণি বর্মন

দুর্গাপূজা ও কালীপূজার প্রাক্কালে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার একটি প্রচারপত্র নজরে এল। সর্বজনীন পূজা পরিচালনার জন্য স্থানীয় সংগঠকদের কর্তব্য নির্দেশ হিসেবে এই প্রচারপত্রটি শিরোনাম ‘মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ’। এটি দেখলে বোঝা যাবে বাঙালি হিন্দুর উৎসব সম্পর্কে সরকার ও পুলিশ কী মনোভাব পোষণ করেন।

কিছু ব্যাপারে শান্তি রক্ষার জন্যই পুলিশ ভেবেছেন। কিন্তু ৩নং নিয়মটি দেখলে বোঝা যাবে পুলিশের আসল উদ্দেশ্য ভিন্ন। নিয়মটিতে আছে ‘পূজা মণ্ডপে মাইক বা বক্স বাজালে এসডিও সাহেবের কাছ থেকে পৃথক অনুমতি নিতে হবে এবং মসজিদের আজানের সময় মাইক বাজানো যাবে না। কোনোভাবে ডি.জে. বক্স বাজবে না।’

বিষয়টি একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে। এসডিও সাহেবের কাছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারটি একমাত্রিক। কেবলমাত্র হিন্দুরাই পালন করবেন শৃঙ্খলা, আইন কানুনের নির্দেশ। যদি প্রশ্ন ওঠে ‘মসজিদের আজান’ দেবার ব্যাপারটি কেন সবাইকে মাইক বাজিয়ে শোনানো হবে? তার জন্য মসজিদ কর্তৃপক্ষ কি আগে থেকে অনুমতি গ্রহণ করেন? নাকি এটা আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে টেকেন ফর গ্রান্টেড? বিষয়টি আরও একটি কারণে গুরুতর। দুর্গাপূজা বা কালীপূজা তো বছরে সামান্য কয়েকদিনের ব্যাপার। সেসময় আনন্দ উৎসবের মাঝখানে সহসা ছেদ ফেলে আজান শুনতে হবে কেন? আজান দেওয়াই বা নিয়ন্ত্রিত হবে না কেন?

মনে হতে পারে বাংলার মুসলমানরা সংখ্যালঘু। তাই তাদের ধর্মাচারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সদিচ্ছা বলে ধরা যেতে পারে। বিষয়টি মোটেই তত সহজ নয়। মুসলমানরা বাংলায় মোটেই সংখ্যালঘু নন— তারা দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু। আর এসব যুক্তি তুমুলভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে না। সেখানে কেন মুসলমানদের আজান দেওয়া নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ জারি করা হবে না? এ বছর বাংলাদেশের সংসদ ভবনে সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাংলাদেশে ব্যাপক হিন্দু বিরোধী অত্যাচার অনাচার চলেছে। সম্প্রতি একটি দলিল আমাদের হাতে এসেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর যেসব অত্যাচার হচ্ছে তার তালিকা। চোখ বোলালেই বোঝা যায় সেদেশে সংখ্যালঘুদের জান-মান-সম্ভ্রম কিছুমাত্র নিরাপদ নয়। তবু, সংসদ ভবনে সরস্বতী পূজার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার একটি বার্তা দিয়েছেন। সহিষ্ণুতার বার্তা।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী পূজা নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রায় সর্বত্র মুসলমান ছাত্ররা আপত্তি জানিয়েছে। তাদের দাবি, সরস্বতী পূজা করা হলে নমাজের সময় তাদের ছুটি দিতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই দাবি মানতে পারেনি। পুজোগুলি একে একে বন্ধ হয়েছে। এই ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গের বহু স্কুলেই দেখা গেছে। যেসব ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা বাস করছি সেখানে এরকম ঘটনা বিপজ্জনক, আপত্তিকর, অন্যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ ওই প্রচার পত্রে লিখেছেন :

‘সমস্ত দুর্গা পূজা ও কালী পূজা কমিটিকে জানানো যাচ্ছে যে তাদের কমিটিতে ইমাম সাহেব, মৌলনা সাহেব বা স্থানীয় সর্বজন গ্রাহ্য ব্যক্তিদের সামিল করবেন। সাম্প্রদায়িক ও সৌভ্রাতৃত্বের মেল বন্ধনে এটি অপরিহার্য।’

ভেবে তাজ্জব বনে যাবার জোগাড়। একি বিচিত্র ব্যবস্থা! ইমাম বা মৌলানা সাহেবরা যদি কমিটিতে থাকতে না চান? ইসলাম ধর্মে তো মূর্তিপূজা অধর্ম, তাদের ধর্মাচারের বিরোধী কাজে তারা যদি অংশ না নেয়? পুলিশ এরকম ক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার কোন উপায় করবেন? এটা ঠিক যে কলকাতা শহরে দু'য়েকটি পূজা পরিচালনা করেন সরকারের মুসলমান মন্ত্রীরা। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ১১ জানুয়ারি হজরত মহম্মদ মক্কায় ফিরে এসে ৩৬০টি মূর্তি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মবিজয়ের সময় মুসলমানরা এই কাজই করে এসেছেন। কয়েক দশক আগে বিশ্বের জনমতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আফগানিস্তানে ভেঙে ফেলা হয় ‘বামিয়ান বুদ্ধ’ এবং এখন ভেঙে ফেলা হচ্ছে নিমরুদের অ্যাসিরিয় সভ্যতার নিদর্শন। কলকাতায় দুর্গাপূজা পরিচালনায় মুসলমান মন্ত্রীরা কেন? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর জানা নেই। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে চাঁদা তুলে এসব কাণ্ড করার জন্য ধর্ম বা ভক্তির প্রয়োজন নেই। সবার উপর চাঁদা সত্য।

উক্ত প্রচারপত্রে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জানিয়েছেন, ৫ অক্টোবর থেকে ৬ অক্টোবর, ২০১৪ (রাত্রি ৮টা পর্যন্ত) প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া চলবে না। কারণ ওই সময় মুসলমানরা পালন করবেন ‘বকরীদ’। ব্যাপারটা তাহলে এই রকম দাঁড়াল : হিন্দুরা উৎসব পালনের সময় মুসলমানদের জন্য ধর্মপালনের নিয়ম অমান্য করতে বাধ্য থাকবেন। পুলিশ অন্তত তাই চাইছেন। মসজিদের আজান দেওয়া বা বকরীদ উৎসবের সময় হিন্দুদের উৎসবে সাময়িক ছেদ ফেলতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পুলিশমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বলেই মনে হয়। একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করার এই সীমাহীন ব্যবস্থাকেই আমরা এতদিন ধর্মনিরপেক্ষতা বলে জানি। হিন্দুরা এসব ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানান না— তাদের মেরুদণ্ড আছে কিনা সন্দেহ হয়। এসব বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতেও তাঁরা ভয় পান। এই ভয়— ‘ফিয়ার-সাইকোসিস’ থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে ঘোর বিপদ আসন্ন। ■

লাহোরে চার্চে জঙ্গি হামলা।

লাহোরে চার্চে জঙ্গি হামলা

পাকিস্তানের মদতের গুনাগার

দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ॥ পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরের ইয়োহানাবাদের দুটি গির্জায় সম্প্রতি দু-দফা আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ১৭ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক তালেবানের জামায়াতুল আহরার শাখা। পাকিস্তানের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর এ ধরনের হামলা নতুন নয়। প্রায়ই তারা ধর্মান্ধ মুসলমান জঙ্গিদের আক্রমণের শিকার হয়। দু'বছর আগে ২০১৩ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পেশোয়ারের একটি চার্চে বোমা হামলায় ৮১ জন নিহত ও শতাধিক লোক আহত হন। এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনাবাহিনী পরিচালিত আর্মি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে উগ্র ধর্মান্ধরা নিরীহ শিশুদের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে অন্তত ১৫০ জনকে। যাদের মধ্যে ১৪২ জন শিশু। এমন বর্বরোচিত হামলার ঘটনা অচিন্ত্যনীয়। যদিও পাকিস্তানে প্রায় প্রতিদিনই জঙ্গি হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটছে কিন্তু শিশুদের ওপর এমন হামলা তো কোনোভাবেই সহ্য করার নয়। তেহরিক-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এই হামলায় দায় স্বীকারও করেছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে তারা এ দেশে আহমদীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর বার বার আক্রমণ চালিয়ে সহস্রাধিক সদস্যকে হত্যা করে। পাকিস্তান নামক দেশটিতে সুন্নীরা আক্রান্ত হচ্ছে, শিয়ারা আক্রান্ত হচ্ছে, হিন্দুরা নির্যাতিতা হচ্ছে, খৃষ্টানরাও আক্রান্ত হচ্ছে এবং আহমদিয়ারা আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশটিতে ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রভাব ও দাপটে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে উগ্রতা যার ফলে আজ এই উগ্রধর্মান্ধ গোষ্ঠীর হাতে পাকিস্তানের সাধারণ নিরীহ মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বন্দী হয়ে আছে।

প্রতিদিন ধর্মান্ধদের হাতে পাকিস্তানে সাধারণ মানুষ মারা পড়ছেন। পাকিস্তানে এমন কোনোদিন অতিবাহিত হয় না কয়েকজনের হত্যার সংবাদ না পাওয়ার। পাকিস্তানের লাহোরে ২০১০ সালের ২৮ মে দুটি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে জুমার নামাজ চলাকালীন ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী অতর্কিত গ্রেনেড হামলা চালিয়ে এবং স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মসজিদে প্রবেশ করে যাতে আমীর ও মসজিদের ইমামসহ ৯৪ জনকে হত্যা ও ১২৫ জনকে গুরুতর আহত করে। একের পর এক আক্রমণ চালানো হচ্ছে পাকিস্তানে অথচ সেদেশের সরকার এসব জঙ্গিদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। এটা বিশ্বের পক্ষে হুমকি স্বরূপ।

পাকিস্তানের জঙ্গিরা বারবার আত্মঘাতী হামলার সাহস কোথা থেকে পায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে এইটুকু বুঝি, গরিব ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের মাদ্রাসায় পড়ানোর সুযোগে একটি উগ্র মৌলবাদী চক্র তাদের মগজ ধোলাই করার কাজে ব্যস্ত থাকে। যারা তাদেরকে এসব উগ্র ধর্মান্ধতা ও 'জান্নাত' লাভের শিক্ষা দেন তারা নিজেরা কিন্তু কখনো জান্নাতে যাবার জন্য এগিয়ে আসেন না বা তাদের নিজ সন্তান-সন্ততিকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হন না। গরিব নিঃস্ব ছাত্রদের কল্পিত জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়েই তারা নিজেদের দায়-দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে উগ্র-মৌলবাদী ও জঙ্গিদের উত্থানের পিছনে কোনো না কোনোভাবে পাকিস্তানের জঙ্গিদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়। পাকিস্তান আজ আন্তর্জাতিকভাবে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত। আল কায়দা, তালেবান- সহ সব জঙ্গিদের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে দেশটি। আল কায়দা প্রধান লাদেনের অবস্থান ছিল পাকিস্তানে। এখনও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো পাকিস্তানের বেশ কিছু এলাকা তালেবান নিয়ন্ত্রিত। মূলত জঙ্গিদের মূল হচ্ছে পাকিস্তান নামক দেশটি। পাকিস্তান সরকার যদি এসব জঙ্গিদের ব্যাপারে পদক্ষেপ না নেয় তাহলে সেদেশের অবস্থা যে দিনে দিনে আরো অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ▌

স্বামী অখণ্ডানন্দের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেবা এবং জনউন্নয়ন প্রকল্প

দেবব্রত ঘোষ

মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে সম্প্রতি স্বামী অখণ্ডানন্দের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী ২০ থেকে ২৮ মার্চ উদ্‌যাপিত হলো নানান বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সারগাছির ৯দিন ব্যাপী মেলায় অডিও- ভিস্যুয়াল প্রযুক্তির মাধ্যমে হাতেকলমে বিভিন্ন মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতনতা-সহ উন্নতমানের কৃষিপদ্ধতি এবং আরো বিভিন্ন বিষয় শেখানো হয়েছে। আমরা ভ্রান্ত ইতিহাসের অসহায় শিকার হয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম, বংশ পরম্পরায় বহন করে চলেছি। যেমন, ভারতে সেবামূলক কাজের প্রথম স্রষ্টা খৃষ্টান মিশনারিরা যার শেষতম সংযোজন মাদার টেরেসা। ধারণাটা ভুল। আধুনিক ভারতে সেবামূলক কাজের শুরু স্বামী অখণ্ডানন্দের হাত ধরে।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন চ্যারিটেবল হসপিটালে প্রতিদিন ২০০- ২৫০ জন রোগী দেখা হয় পুরো ফ্রিতে। এছাড়া হাসপাতালে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক তিনটি চিকিৎসা বিভাগই রয়েছে, সেখানে দূরদূরান্তরের গ্রামবাসীরা বিনামূল্যে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন মাত্র ১০ টাকার একটা টিকিটের বিনিময়ে এবং ওই ১০ টাকার মধ্যেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ফীজ ও যাবতীয় ওষুধপত্রের খরচ ধরা থাকে। অ্যালোপ্যাথি বিভাগে জেনারেল মেডিসিন, দাঁত, চোখ, বুক, স্ত্রীরোগ, অস্থিরোগ-সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরামর্শ পেয়ে থাকেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া নিয়মিতভাবে আশ্রমে অ্যালোপ্যাথি, হ্যোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের ক্যাম্প বসানো হয় বিনামূল্যে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে। উন্নতমানের আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনেও তৈরি করা হয়। আয়ুর্বেদিক ওষুধের ওপর নিরন্তর গবেষণাও চলছে সমান্তরালভাবে। সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নিজস্ব ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থাও রয়েছে। বিনামূল্যে মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যান পরিষেবার মাধ্যমেও সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকে নিয়মিত।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্কুলও রয়েছে। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধর্মের সারভাগ থেকে নির্বাচিত অংশও ছাত্রদের পড়ানো হয়ে থাকে যাতে তারা সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নতমনা এবং জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠতে পারে। আশ্রমের স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু আছে, যেখানে রোজই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে ছাত্রদের, যেটা অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোতে স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ভারতবর্ষ জুড়েই রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য চালিয়ে থাকে, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমও তার ব্যতিক্রম নয়।

এছাড়াও সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন এলাকার বিভিন্ন গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য সমীক্ষার কাজে হাত দিয়েছে। সারগাছি আশ্রমের বর্তমান সেক্রেটারি স্বামী বিশ্বময়ানন্দ (যিনি তুষার মহারাজ নামে সমধিক পরিচিত) সারগাছির আগে অনেক বছর ধরে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি ছিলেন। স্বামী বিশ্বময়ানন্দ ৪ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সেবা এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটা মডেল গড়ে

তুলতে যা একদিন সারা রাজ্যকে পথ দেখাবে। কারণ বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল ও পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত এলাকায় কর্ম প্রবাহকে চলমান রাখা, উন্নয়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেবা ও ত্রাণকার্যকে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও গতিময় করে রাখা অনেকটা কঠিন শহরাঞ্চলের তুলনায়। সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে ও সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্যমে স্বামী বিশ্বময়ানন্দ কাজ করে চলেছেন যে শক্তিতে তা তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দের ঐশী প্রেরণায় এবং অতি অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে অর্জন করেছেন।

এটা অতি বাস্তব সত্য ও তথ্য যে এই ধরনের নিয়মিত ব্যাপক সেবাকর্ম ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান করে চলেছে। খৃষ্টান মিশনারিরা যতোটা সেবামূলক কাজ করে থাকে তার থেকে শতগুণ বেশি প্রচার পেয়ে থাকে আর ভারতীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি যতোটা সেবামূলক কাজ করে থাকে তার শতাংশের একভাগ প্রচারও পায় না। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভাবধারায় সেবাই প্রথম এবং অন্তিম লক্ষ্য। প্রচার ব্যাপারটাই গৌণ। খৃষ্টান মিশনারিরা যে পরিমাণ বিদেশি অনুদান ও সক্রিয় সমর্থন পেয়ে থাকে সেটা রামকৃষ্ণ মিশন পায় না, তবুও তাদের সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজের ব্যাপ্তি, গুণমান এবং অবদান খৃষ্টান মিশনারিদের চাইতে অনেকগুণ বেশি।

পরাধীন ভারতবর্ষে অনাথ, আর্ত মানুষদের সেবাকার্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী অখণ্ডানন্দ। সময়টা ১৮৯৭ সালের ৩১ আগস্ট। কলেরা রোগাক্রান্ত নুটুবিহারী দাস ছিলেন সেই মহামারীর প্রথম শিকার। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাকে আরোগ্য করে তোলার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মিশনের সূচনা হয়েছিল স্বামী অখণ্ডানন্দের হাত ধরে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের প্রতি নিরলস সেবা এবং শ্রদ্ধাপরায়ণতার যে অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ, শুভানন্দ, অচলানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী সুরেশ্বরানন্দ, তার তুলনা অতীত ও সমকালীন ইতিহাসে বিরল।

পরাধীন ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে— (১) ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কর্তৃক দিনাজপুরের দুর্ভিক্ষে সেবাকর্ম, (২) ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসে স্বামী বিরজানন্দ কর্তৃক দেওঘরে দুর্ভিক্ষে সেবাকর্ম, (৩) ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামী স্বরূপানন্দ কর্তৃক কিষেণগড়ের দুর্ভিক্ষে সেবাকর্ম, (৪) ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক ভাগলপুরে বন্যাত্রাণে সেবাকর্ম, (৫) ১৯০০ সালের মে মাসে স্বামী সুরেশ্বরানন্দ কর্তৃক খাণ্ডোয়ার দুর্ভিক্ষে সেবাকর্ম। তখন মিশনারিরা কোথায়? ১৮৯৭ সালে সেবাকর্মের যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন মাদার টেরেসার সেবাকর্মের সূচনা তো দূরের কথা, অঙ্কুরোদ্গমও হয়নি।

অনাথ বাবর শেখ ও ইমাম শেখ স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল সারগাছিতে এবং নিজেদের ইসলাম ধর্মকে পালন করেও আমরণ সারগাছি আশ্রমে থেকে গিয়েছিল। কারণ স্বামী অখণ্ডানন্দের ভালবাসা। সারগাছি আশ্রমের নেপালি কুলি বাহাদুর রোগজীর্ণ শরীরে বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা না থাকলেও অপরের সেবা নিতো না, মৃত্যুর আগে বাহাদুরের ইচ্ছে হয়েছিল বেলুড় মঠের ঠাকুরঘরে যাবার, সে ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব ছিল না স্বামী অখণ্ডানন্দের পক্ষে। ১৩ বছর বয়সের বাহাদুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ও গীতা বুকের ওপর রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে চিরবিশ্রাম নিয়েছিল।

খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবাকাজ মূলত বনবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে প্রান্তিক অশিক্ষিত এলাকায় যা বহুক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরকরণের একটা হাতিয়ার। এই কাজটা পরাধীন ভারতেও খৃষ্টান মিশনারিরা করতো এবং স্বামী বিবেকানন্দ ওই মিশনারিদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন বলে মিশনারিরা বিবেকানন্দকে নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করেছে যার ইতিহাস আমরা জানি। এখনও অবাধগতিতে খৃষ্টান মিশনারিরা সেবার আড়ালে ওই একই কাজ করে চলেছে। কিন্তু কারো ধর্মে হাত না দিয়ে, কারুর ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত না করেও যে সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় রামকৃষ্ণ মিশন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রতিষ্ঠিত সারগাছি আশ্রম ১০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে নীরবে যার উদাহরণ পরাধীন বা স্বাধীন ভারতে নেই; খৃষ্টান মিশনারিরা নৈব নৈব চ। ■

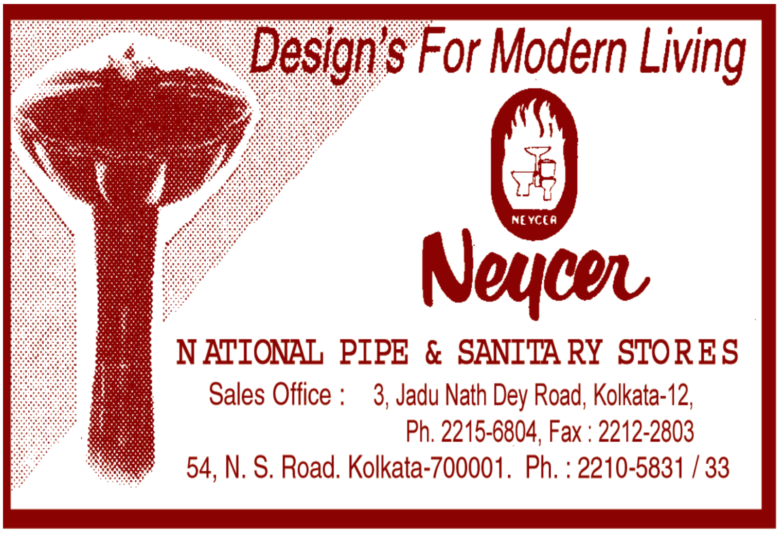

এগিয়ে চলেছে দেশের সর্বকনিষ্ঠ তিরন্দাজ

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাত্র দু' বছর বয়স। যে বয়সে একটি শিশুকে আপন মনে খেলতে দেখা যায়। হাজারও দুষ্টুমি তার মাথায় ভিড় করতে থাকে। টলমল পায়ে হাঁটতে থাকা শিশুটি কখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার পছন্দের কার্টুন চরিত্রের দিকে। কিন্তু এই চিরাচরিত ভাবধারা থেকে বেরিয়ে এসে এক অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছে ডলি শিবানী চেরুকুরি। তার জীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন তিরন্দাজ বাবা। সেই কারণেই বংশ পরম্পরায় তিরন্দাজি সত্তাকে ধরে রাখতে পেরেছে ডলি শিবানী।

শিবানীর বেড়ে ওঠা অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের দক্ষিণে বিজয়ওয়াড়াতে। তার বাবা চেরুকুরি সত্যনারায়ণ একজন তিরন্দাজি প্রশিক্ষক। শিবানীর দাদাও একজন আন্তর্জাতিক

লক্ষ্যভেদে মগ্ন শিবানী।

খ্যাতিসম্পন্ন তিরন্দাজ এবং প্রশিক্ষক ছিলেন। ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমসের ঠিক পরেই এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ছেলের অকাল প্রয়াণে মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েন চেরুকুরি সত্যনারায়ণ। তবে তার এই মানসিক ধাক্কা প্রথম নয়। ২০০৪ সাল নাগাদ তিনি তাঁর প্রথম কন্যাসন্তানকে হারান। এর ঠিক ছয় বছর পরে ছেলেকে। স্বাভাবিকভাবেই নিঃসন্তান দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় সারোগোসির মাধ্যমে তারা আর এক সন্তান নেওয়ার। সেই কন্যা সন্তানই আজকের সফল তিরন্দাজ ডলি শিবানী।

ডলি যখন মাতৃগর্ভে তখনই তার বাবা নির্দিষ্ট করে ফেলেন এই সন্তানকেও তিনি তিরন্দাজ হিসাবে গড়ে তুলবেন। ডলির জন্মের পর তার নিত্যসঙ্গী ছিল এক বিশেষ ধরনের তির-ধনুক। অর্থাৎ শৈশব থেকেই সে যেন আকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে তির-ধনুকের প্রতি। ডলি দাঁড়াতে শেখার পর থেকে শুরু হয়ে যায় তার তিরন্দাজি প্রশিক্ষণ। চেরুকুরি সত্যনারায়ণ নিজের অ্যাকাডেমিতেই শুরু করেন মেয়ের প্রশিক্ষণ। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর মাত্র দু'বছর বয়সেই সাফল্যের শীর্ষে ওঠে ডলি শিবানী। দেশের সর্বকনিষ্ঠ তিরন্দাজ হিসাবে পাঁচ ও সাত মিটারের বেশি দূরত্ব থেকে তির নিক্ষেপ করে ২০০ পয়েন্ট জিতে নেয় সে। এর আগে যাঁরা করেছেন তা আরও পরিণত বয়সে। কিন্তু ডলির এই রেকর্ড সত্যিই অভাবনীয়। এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসেও নাম উঠে গেল সর্বকনিষ্ঠ তিরন্দাজ হিসেবে ডলি শিবানীর।

৫ এবং ৭ মিটার দূরত্ব থেকে ৩৬টি তির নিক্ষেপ করে মোট ৩৮৮ পয়েন্ট তার দখলে। যা দেখে রোমাঞ্চিত ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের আধিকারিকগণ। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী বলেন, 'ডলি এতটা ভাল ফল করবে আশা করা যায় কি? আমরা ভেবেছিলাম দু'টি দূরত্ব থেকে মোট ২০০ পয়েন্ট করবে। কিন্তু সে যে ছাপিয়ে গিয়ে প্রায় এর দ্বিগুণের কাছাকাছি করবে তা ভাবা যায়নি। তবে তার এই রেকর্ড ভাঙা অন্যদের কাছে খুবই শক্ত। তবে মেয়ের ব্যাপারে আগে থেকেই বেশ কিছুটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন চেরুকুরি সত্যনারায়ণ তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'জন্মের পর থেকেই চ্যাম্পিয়ন হবার প্রশিক্ষণ লাভ করেছে শিবানী।' পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'শিশুকাল থেকে ওর গতিবিধি দেখে বোঝা গিয়েছিল একজন দক্ষ তিরন্দাজ হয়ে উঠবে ও।' ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের সোনার মেডেল এবং শংসাপত্র শিবানীর হাতে তুলে দেওয়া হলে তার বাবা বলেন, 'আমার কন্যা ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে, যা আমার স্বপ্ন ছিল—আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না যে আমার পরিবার এজন্য কতটা খুশি।' তবে তিনি পরে বলেন, এবার চেষ্টা করব শিবানীর নাম কীভাবে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তোলা যায়। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

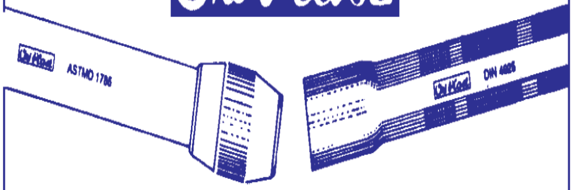

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ধর্মের মহান আচার্যগণ আমাদের একথাই শিক্ষা দেন, কি করে আমরা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে চিরকালের মতো ত্যাগ করে এমন এক বিষয়ের প্রতি চেতনাকে জাগ্রত রাখতে পারি, যা এই জগৎ থেকে অনন্ত গুণে মহান। এভাবে অগ্রসর হয়ে যখন আমাদের লাভের পরিমাণ উপলব্ধি করি, তখন তাঁদের প্রতি এক অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করি; সেইসঙ্গে অনুভব করি, আমরা এক মহামূল্য সম্পদ লাভ করেছি। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না, মানুষের কাছে মানুষ যতটা পেতে পারে, এই ধর্মীয় আচার্যগণের (ঋষিদের) কাছে আমরা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু পেয়েছি।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

মায়ের ‘প্রসাদ’ স্মরণে

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লীপ্রাণ প্রসাদ চক্রবর্তী ১৯১৪ সালে ৮ মার্চ হাওড়া জেলার এক অজ গ্রাম তাজপুরে পল্লীমায়ের কোলে ভূমিষ্ঠ হন। ঠাকুরের কৃপায় সেই বালক ক্রমে ক্রমে গ্রামের মানুষের একজন অবলম্বন, একজন স্নেহময় নির্ভীক পথ প্রদর্শক রূপে পল্লীমায়ের সেবকের দায়ভার গ্রহণ করে

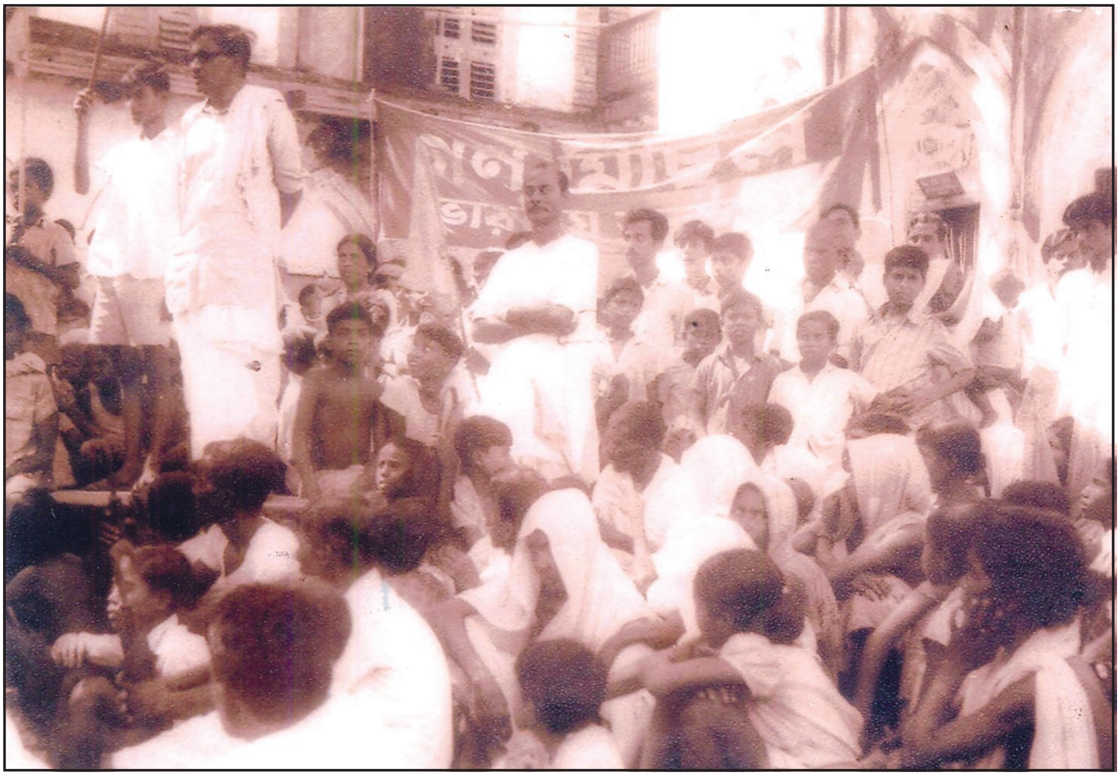

হাওড়া নারিটে বিডিও ঘেরাও। উপস্থিত জনসঙ্ঘ নেতা প্রসাদ চক্রবর্তী, সুকুমার ব্যানার্জী ও নেত্রী সবিতা ব্যানার্জী (২৫.০৯.১৯৭৪)।

জনমানুষের মনমাঝারে আপন স্থান করে নেন! উনি কারোর কাছে শুধু প্রসাদ, কারোর প্রসাদদা, কারোর কাছে বাবু, আরও কতশত স্নেহের ডাকে ব্যস্ত থাকতেন। ঠাকুরের শিবজ্ঞানে জীব সেবা করার ভাবনা তাঁর মনে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছিল। সেই কারণে এই মূল মন্ত্রটা তিনি সেবার দানে উপলব্ধি করেছিলেন। সে কারণে ভবিষ্যতে তাঁর সেবক অনুগামী সংগ্রহে কোনো অভাব দেখা যায়নি। ‘আপনি করিয়া কাজ অপরে শিখাও’ এই ছিল তাঁর কাছে আগ্রহ ও উৎসাহ যোগানের মর্ম কথা। নারিট, তাজপুর, কুশবেড়িয়া অঞ্চলের ও নিম্ন দামোদরের প্রতি বছরের বর্ষার প্রবল বন্যার ভাবনা ও উদ্বেগে সমস্ত বৎসর কী করে পল্লীবাসীদের জীবন-ধন-গৃহ রক্ষা করা যায়, কী করে জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া শিশু ও পশুদের বাঁচানো যায় তারই পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সেই থেকেই নিম্ন দামোদরের সংস্কারের ভাবনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য আন্দোলনের ভাবনায় সমস্ত পল্লীবাসীকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। প্রদেশের নেতাদেরও এই বিষয়ে জ্ঞাত করান ও দেখার জন্য আবেদন করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৪৫ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাজপুর, কুশবেড়িয়া অঞ্চলে আসেন। ‘শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অফ কালচার’ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে মাটি ঘিরে একটা ১৩ কিলোমিটার ও একটা ৫ কিলোমিটার বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ গড়ে ওঠে প্রসাদবাবুর নেতৃত্বে। সেই থেকেই গ্রাম উন্নয়নের বা বাঁধ সংস্কারের কাজ, পল্লীবাসীর উন্নয়ন ক্ষেত্রে যত কিছু কাজ এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতার মাধ্যমে হতে থাকে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলো। চতুর ইংরাজ দেশে ‘বিভেদ কর ও রাজ কর’ সূত্র ধরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দাঙ্গা লাগিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটাকে ভাগ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ঘোষণা করল। আমরা দেশকে স্বাধীন করলাম— এই আত্মতৃপ্তিতে মশগুল হলাম। কিছু মানুষ কিন্তু দেশ জননীর খণ্ডিত প্রতিচ্ছবি ভাবতেও মুর্চ্ছিত হতে থাকেন, বুক চাপড়ে ধিক্কার দিতে থাকেন দেশের কতিপয় নেতাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। ইংরাজ লাটসাহেব ও তার পরিবারের কাছে মাথা নত করে হাত কচলে এদেশের তৎকালীন নেতৃত্ব দেশ ভাগের মান্যতা পত্রে স্বাক্ষর করে বাধিত হলেন। এমনই সময় মহাত্মা গান্ধী নিহত হলেন।

দেশে রাজনৈতিক উথাল পাথাল শুরু হলো। পশ্চিমবঙ্গ নামের যে খণ্ডটি রয়ে গেল (ড. শ্যামাপ্রসাদবাবুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও তাঁর দূরদৃষ্টিতে) তারই উপর বন্যাস্রোতের মতো হাজার হাজার গৃহহারা, সন্তান- সন্ততি-সহ মানুষজন একটু আশ্রয় পাবার জন্য ঝাঁপাতে লাগল। সেদিনগুলির কথা ভাবলে আজও মুখে অন্ন তোলার আনন্দ উচ্ছ্বাস সব স্তব্ধ হয়ে যায়। ড. শ্যামাপ্রসাদের দয়ায় ও প্রসাদবাবুর মতো ব্যক্তিদের চেষ্টায় ও ঠাকুরের আশীর্বাদে ক্রমশ স্থায়ী পেরেছে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থীরা।

রাজ্য রাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। মুসলিম লীগ পাকিস্তান পেয়ে গেছে। এই ভাবনা চিন্তা মাথায় রেখে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে দিল্লীতে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল ১৯৫১ সালে গঠিত হয়। এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল (সংবিধান সম্মত) ক্রমশ মানুষের মনে নতুন আশা ও ভরসার স্থান গ্রহণ করতে শুরু করে। সমস্ত প্রদেশে সংগঠন তৈরি হয়। শ্যামাপ্রসাদবাবু কেন্দ্রে ও প্রদেশে দু' জায়গায় দায়িত্ব নেন। পশ্চিমবঙ্গে সহসভাপতি শ্রীহরিপদ ভারতী, ড. আবদুল আবনী সাহেব, কর্নেল ভাদুড়ী-সহ আরও কয়েকজন। সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সত্যেন বসু ও অ্যাডভোকেট নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়। সংগঠন সম্পাদক --- রামপ্রসাদ দাস, প্রভাকর ফেজপুরকর। হাওড়া জেলায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সভাপতি হন প্রসাদ চক্রবর্তী (অ্যাডভোকেট), সহসভাপতি কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক সাধন বসু, কমল মিত্র। সম্পাদক সমর কুণ্ডু, শৈল রায়, মণিলাল বসু, শচীন মুখোপাধ্যায়, চিত্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। চিত্ত চক্রবর্তী প্রসাদবাবুর বড় ছেলে। এই প্রতিবেদক আরএসএস-এর প্রচারক হিসাবে ১৯৪৪ সাল হতে প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন জেলার কাজ করে এবং তার পর সঙ্ঘ-অধিকারি ভাওরাও দেওরসজী তাকে হাওড়া জেলার দায়িত্ব দেন। পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের দায়িত্ব দেন। নিম্ন দামোদর সংস্কারের আন্দোলনের জন্য যতদূর মনে হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রসাদবাবু দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিম্ন দামোদর সংস্কারের জন্য ডাক দেন। সেই আন্দোলনে সর্বশ্রী পান্নালাল দাশগুপ্ত, হরিপদ ভারতী, অমল গঙ্গোপাধ্যায়, আজকের লেখক-সহ বহু নেতা তাজপুর কুশবেড়িয়া অঞ্চলে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর গৃহে উপস্থিত হন। পাশেই দামোদর নদী, সেখানে কোদাল, গাঁইতি, বেলচা, ঝুড়ি প্রভৃতি নিয়ে স্থানীয় বহু মানুষ, যুবক এবং কিছু মহিলা নদী সংস্কারের কাজে হাত লাগাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ ওখানে যাবার পর প্রত্যেকেই প্রথমে এক একটা সংস্কার করার যন্ত্র হাতে নিয়ে প্রথমে নদীর ধারে কোপ বসায়, সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতার জয়ধ্বনি উঠতে থাকে। সংস্কারের কাজে সকলে এক মনে এক প্রাণের আবেগে লেগে পড়েন। মিলিত কাজের আনন্দ উচ্ছল মুখমণ্ডল ঘামে ভিজে প্রথম রোদে চকচক করেতে থাকে। মনে মনে একটা ছড়া মনে পড়তে থাকে—

'সবে মিলি করি কাজ,
হারি-জিতি নাহি লাজ।'

সর্বদলীয় রাজনৈতিক দলগুলি ব্যক্তিগত পার্টিগত স্বার্থ ভুলে দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখলে মঙ্গলই হয়।

তাজপুর থেকে তপন রীতের ফোনে প্রসাদবাবুর ৮ মার্চ জন্ম শতবর্ষের দিনের কথা যখন শুনলাম, মনে হতে লাগলো কদিন আগেই যেন তাঁর সঙ্গে কতসব সভা, সমিতি, প্রদেশ সমিতির বৈঠকে কত আলোচনা বিতর্ক হয়েছে, যেন এই সেদিন তাঁর সঙ্গে উলুবেড়িয়ার কোর্টে নয়তো তাঁর বসার সেরেস্তায়। বড় বড় জানলা দিয়ে আমাকে ও কমল মিত্র-কে দেখেই হুকুম— কার্তিক বাহাদুর! সুকুমারবাবু এসে গেছেন, চায়-লাও, চা আনো। বসে কত কথা আলোচনা। ড. শ্যামাপ্রসাদ শিবিরের উন্নয়নের কথা, ওখানে নিয়ে যাওয়ায় একান্ত আগ্রহ যেন কথা ফুরতো না। ভাবতে থাকি গাঁট্টাগোট্টা চেহারার বড় বড় চোখ চশমার ভেতর থেকে যেন ঠায় এক নজর করে রয়েছে উত্তরের অপেক্ষায়? ভাবছি ক'দিন আগেই নারিটে প্রসাদবাবু বাংলার জনসঙ্ঘের কার্যকারিণীর সভা করার জন্য জোরদার বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, পল্লীগ্রামের কর্মীদের ও মানুষজনের কাছে জনসঙ্ঘের নেতাদের উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলার সভাপতি দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভা করার অনুমতি দেন। উৎফুল্ল প্রসাদবাবু শান্ত হন। উক্ত সভায় জনসঙ্ঘের সভাপতি দেবপ্রসাদ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সহ-সভাপতি বাংলার হরিপদ ভারতী, ড. আবদুল আলী, সত্যেন বসু, কর্নেল ভাদুড়ী, মাখনলাল সেন, নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ দাস, প্রভাকর ফৈজপুরকর-সহ সকল প্রদেশের নেতা-নেতৃগণ নারিটে উপস্থিত হন। আমতা থেকে নারিট সভাস্থল পর্যন্ত দেবপ্রসাদবাবু, দীনদয়ালজী প্রমুখকে পাল্কী করে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি সকলে হেঁটে গোরুর গাড়িতে সাইকেলে নারিট পর্যন্ত যান। এই সভার মাধ্যমে ও প্রসাদবাবুর পল্লীসেবার কারণে ওই এলাকার মানুষ জনসঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের গতি ও প্রকৃতির বৃদ্ধি ঘটে, আস্থা স্থাপিত হয়। চোখের সামনে নিমেষে ছবির মতো দৃশ্য ভেসে চলে গেল। মনে ব্যথা বেজে উঠলো, তাজপুর যাবার ডাক প্রসাদবাবুর ব্যথারূপে বেজে উঠলো— '৮ এপ্রিল ২০১৫ তোমার আসা চাই। তোমায় যেন দেখতে পাই।'

(লেখক ভারতীয় জনতাপার্টি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পল্লীপ্রাণ সমাজসেবী প্রসাদ চক্রবর্তীর কর্ম-সাধনা

তপন রীত

জীবনে অজানা অদেখা অনেক মহান মানুষের জীবন কাহিনি বইয়ের পাতায় পড়েছি যার মধ্য দিয়ে তাঁদের অসামান্য কীর্তি-কাহিনি অবগত হয়েছি। কিন্তু আজ এমনই একজন মানুষকে উপস্থাপন করতে চলেছি যিনি নিজে অত্যন্ত প্রচার বিমুখ ছিলেন— যাঁর কোনো কাহিনি কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। অনেক পুণ্যফলে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তাঁর জীবনের শেষে ১৬ বৎসর তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে জেনেছি মহাপুরুষদের মনন-চিন্তনে তিনিও সমগোত্রীয়। আলো যেমন দূরের মানুষকে আকর্ষণ করে তেমনই তাঁর আদর্শ, কর্মধারায় অসংখ্য সাধারণ ও অসাধারণ সকল রকমের মানুষই আকৃষ্ট হয়েছেন। একান্ত আলাপচারিতায় তিনি তাঁর নীরব কর্মসাধনার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন 'ডান হাত কাজ করলে বাম হাত জানবে না।' কাজের পরিধির সীমাবদ্ধতার সপক্ষে বলেছেন, 'আমি স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে কাজ করার দৃষ্টান্ত-সহ একটা দীপশিখা প্রজ্বলিত করেছি— যা দূরের মানুষকে আকর্ষণ করবে।' আজীবন নীরব কর্মসাধনায় ব্রতী মানুষটি হলেন পল্লীপ্রাণ সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় প্রসাদ চক্রবর্তী। তিনি শুধু সকলের 'বাবু' অর্থাৎ অভিভাবক এবং গৃহী হয়েও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

আমার প্রথম পরিচয়ের দিন আলোচনায় শোনালেন কতকগুলি কথা যা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কবিতার একটি ছত্র—

"ও তুলসী! তুমি যবে এসেছিলে ভবে—
তুমি মাত্র কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে।
এমন জীবন হবে করিতে গঠন—
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

বিবেকানন্দের অমর বাণী : 'মানুষ হয়ে যখন জন্মেছ একটা দাগ রেখে যাও।' পরবর্তীকালে অন্যদের কাছেও একইরকম আলোচনার কথা জেনেছি।

অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু করেন। বুনিয়াদি শিক্ষা শেষ করে ৩ মাইল দূরে নারিট ন্যায়রত্ন বিদ্যালয় হতে এন্ট্রান্স পাশ করেন। নারিট বিদ্যালয়ের শিক্ষক গঙ্গাগোবিন্দ রায় মহাশয়ের সাহচর্যে চারিত্রিক বিকাশ ঘটে। শিক্ষকমহাশয় পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে প্রথম

বই পড়তে দেন রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, বিবেকানন্দ, আনন্দমঠ। ছাত্রাবস্থায় সংগঠন দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় থেকে আইন পড়েন ও ছাত্রজীবনের ইতি টেনে কর্মজীবনে প্রবেশ। কর্মজীবন শুরু উলুবেড়িয়া মহকুমা ফৌজদারি আদালতে আইনজীবী হিসাবে। অল্প সময়ে অনন্য দক্ষতার পরিচয় রাখেন।

ছাত্রাবস্থা হতেই এলাকার হতদরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে বিচলিত করে তোলে। তাঁর মনবেদনা প্রকাশের পথ হিসাবে প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে উদ্যোগী হন। দৈনিক বসুমতী পত্রিকার তিনি প্রায় নিয়মিত কলমচি হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখনীর বিষয়— পান চাষ-সহ অন্যান্য চাষ ও চাষির সমস্যা ও তার সমাধান, নিম্ন দামোদরের ফি বছর বন্যা ও তার প্রতিকার।

এইসব সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক ভাবে করা সম্ভব ভেবেই তাঁর পরিচালিত সামাজিক সংগঠনের বন্ধুদের নিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। প্রথমে হিন্দুমহাসভা পরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের নেতা হিসাবে একাদিক্রমে ২৫ বৎসর তাজপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা দখল করে প্রেসিডেন্ট পদে ব্রতী থেকেছেন। তার হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘ পরিচালিত বোর্ডে অনেক মুসলমান সদস্য থেকেছেন।

তাঁর বহুমুখী কর্মধারায় প্রথম স্থান পেল মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যা সমাধান। মানুষের স্বার্থে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বহু আন্দোলন সংঘঠিত করেন। উৎপন্ন ফসলের এক অংশ জমিদার, এক অংশ তাদের প্রতিনিধি ও এক অংশ চাষির। এই অবস্থায় চাষিরা সর্বস্বান্ত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো জমিদার তার প্রতিনিধির মাধ্যমে নমুনা সমীক্ষা করে প্রতি বৎসর রাজস্ব ধার্য করে দিতেন। এই পদ্ধতিকে বলা হোত কুত প্রথা। উক্ত দুই চাষি স্বার্থ-বিরোধী রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে (প্রথমটি তেভাগা ও দ্বিতীয়টি কুত প্রথা) স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সংগঠিত করে তা রদ করতে সমর্থ হলেন।

জমিতে চাষির রায়তীস্বত্ত কায়েমের জন্য জমিদারের জমি দখল (বাঁশগাড়ি দখল) ঠেকাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে চাষিদের নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন, পরে আইনের মাধ্যমে লড়াই শুরু করেন— যা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছয় এবং সাফল্য লাভ করেন।

তাঁর কর্মজীবনের মূল্যবান সময় দামোদরের বন্যা ও তাঁর প্রতিকারে ব্যয়িত হয়েছে। দামোদরের পশ্চিম তীরকে বাৎসরিক বন্যার মুক্তাঞ্চল হতে সুরক্ষিত করার আন্দোলন তাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলতেন--- 'দুর্দিন-দুর্ভোগ-দুর্যোগ মানুষের জীবনে অভিশাপ, কর্মীর জীবনে আনে আশীর্বাদ'। মানুষের এই দুর্দিনকে তিনি রাজনীতির হাতিয়ার করেননি। বন্যার সময় বন্যা প্রতিরোধ ও পরবর্তী সময়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME
LED
CFL
FAN
PIPES
The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

তথা দামোদর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। হাজার হাজার মানুষ প্রয়োজনের সময় বাঁধ রক্ষার কাজে পরে দামোদর সংস্কার আন্দোলনে সামিল হন।

গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা বাঁকড়া, পানশীলা, শীতলচকে স্থানীয় গ্রামবাসীর রাত্রিতে দেওয়া স্বেচ্ছাশ্রমে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করেন— যা 'প্রসাদ রোড' নামে খ্যাত।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হলেন। তাঁর আহ্বানে অসংখ্য ছাত্র-যুবক আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করে।

কৃষক আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে গঠন করেন তাজপুর ও কুশবেড়িয়া কৃষিকল্যাণ সমিতি। চাষিদের আন্দোলনে কৃষি কল্যাণ সমিতি সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

তৈরি করেন কয়েকটি সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি। সমবায়ের মাধ্যমে মহাজন নিগ্রহ হতে চাষ ও চাষির স্বার্থ রক্ষাই উদ্দেশ্য। তাজপুর ও কুশবেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি দুটি এখনও সক্রিয়।

বন্যার কবল হতে এলাকাকে সুরক্ষিত করতে তাজপুর চক্রবাঁধ নির্মাণ করেন যার পরিধি ১৬ কিলোমিটার। যে কাজের শুভ উদ্বোধন ঘটেছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কল্যাণ হস্তের পরশে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বুভুক্ষু মানুষের মিছিল দেখে তাঁর দরদি হৃদয় কেঁদে উঠে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন ত্রাণ পরিচালনা করছেন। প্রসাদবাবুকেও ত্রাণসামগ্রী প্রদান করেন। 'ক্ষুধিত মানুষ রামায়ণ, মহাভারত, কোরান, বাইবেল নর্দমায় ফেলে দেবে।'

প্রসাদবাবুর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা অপরিসীম যার জন্য ৪৬-এর দাঙ্গার আগুনে যখন সারা বাংলা পুড়ছে তখন তাজপুরে দাঙ্গার আঁচ লাগেনি।

১৯৫৯-এর বিধ্বংসী বন্যা প্রসাদবাবুর জীবনের দিক পরিবর্তন ঘটালো। বন্যার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংসার ভুলে গেলেন। শেষে একদিন স্ত্রী-পুত্রের সম্মতিক্রমে গৃহী প্রসাদবাবু সন্ন্যাসীতে পরিণত হলেন— আর কখনও গৃহে ফিরে যাননি। শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউটেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৯৮৬-র ২ ফেব্রুয়ারি)।

বন্যার অব্যবহিত পরে নারিট সিরোল-নোরিট গ্রামে তিন মাস ত্রাণ কাজ চলে নারিটের ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বন্যাকালীন অবস্থায় তাজপুরে আসেন এবং পরে কলকাতা হতে গোপাল দাস মুণ্ডাকে প্রেরণ করেন ত্রাণ কাজ করার জন্য। তাজপুর চক্রবাঁধের মধ্যবর্তী গ্রামগুলিতে ত্রাণ পরিচালনা হোত তাজপুর ঘাটকুলের নিকট নির্মিত অস্থায়ী শিবির হতে। এই শিবিরের নাম ছিল ১৯৫৯-এর বন্যাস্মৃতি জাতীয় শিবির। পরবর্তীকালে এই শিবিরের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ হয় শ্যামাপ্রসাদ সাংস্কৃতিক শিক্ষণ শিবির, পরে শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব্ কালচার। গ্রামোন্নয়নে নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

এই সময় হতেই একটি স্থায়ী কার্যালয় গঠনের প্রয়োজনীয়তা জরুরি বলে বিবেচিত হয়। এক কথায় সংস্থার কার্যালয় মানুষের দেওয়া স্বেচ্ছাশ্রমের ফসল। ১৯৫৯-এর বন্যার পর ১৯৬০ সালে সাড়ম্বরে গঙ্গাপূজায় মাটির পুতুলের মাধ্যমে ভগীরথ লীলা আলেখ্য- সহ বিশাল মেলার আয়োজন করেন। ১৯৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ সাড়ম্বরে পালন করেছেন। অনুরূপভাবে ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবর্ষ পালিত হয়।

দামোদর মজে যাওয়ায় নদীপথে যাতায়াত ব্যবস্থা অচল, চাষির জমি জলায় পরিণত, নদীতে মাছ ধরা লোকজন বেকার, সেচব্যবস্থা অচল প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি স্তব্ধ। পূর্বতীরের মানুষ প্রসাদবাবুর আন্দোলনে সামিল হয়ে আন্দোলনের বৃহত্তর মঞ্চ গড়ে তুলল। নিম্ন দামোদর সংস্কার আন্দোলন কমিটি তৈরি করে দীর্ঘ ২ বৎসর তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করে আন্দোলন সফল হলো। সংস্কারের কাজ শুরু সরকারি টালবাহানার কারণে ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে প্রসাদবাবু ঐতিহাসিক আন্দোলনের ডাক দেন। তাজপুর ফেরিঘাটে ১০ হাজার মানুষ কোদাল নিয়ে হাজির হয় দামোদর কাটার জন্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন অধ্যক্ষ হরিপদ ভারতী, বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত। পরে ৩ বৎসর ধরে পর্যায়ক্রমে দামোদর কাটার ফলে নদী গতি ফিরে পায়। বন্যার প্রকোপ আরও স্তিমিত হয়। শুরু হয় প্রসাদবাবু তথা এসপিকের বহুমুখী গ্রাম উন্নয়ন কার্যসূচি। এইসব উদ্যোগের ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সমস্যার প্রভূত উন্নতি ঘটে।

১৯৭৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার ফলে দীর্ঘদিনের কর্মসাধনার ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। শোকস্তব্ধ, হতাশাগ্রস্ত মানুষদের ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন— চাষিদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ক্ষয়ক্ষতি সাহায্য সংগ্রহ করে গ্রামীণ পুনর্বাসন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এলাকার সকল চাষিদের বিভিন্ন ধরনের বীজ, সার, সেচ, ত্রাণ হিসাবে দিয়ে চাষের সহযোগিতা করলেন। হতাশাগ্রস্ত মানুষদের কাজের মধ্যে যুক্ত করে দিয়ে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করলেন।

সহায় সম্বলহীন ১১০০ পরিবারের জন্য তিন মাস রান্না করা খাবার সরবরাহ করে ত্রাণের শেষে ১১০০ পরিবারের জন্য ১১০০ লেপ তৈরি করে বিতরণ করে ত্রাণের ক্ষেত্রে অনন্য নজির স্থাপন করলেন।

উক্ত ১১০০ পরিবারের ধ্বংস হওয়া বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে সহায়তা করা হলো। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার ৯টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ করে ক্রমবর্ধমান ছাত্রদের স্থান সংকুলান তথা বিদ্যালয় পরিসরের উন্নয়ন করা হয়। বন্যা-নিরোধক ২টি চক্র বাঁধের ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হয়। দুই গেট (দরজা) যুক্ত একটি স্লুইস গেট তৈরি করে প্রায় ১৬টি গ্রামকে বাৎসরিক বন্যার কবল হতে মুক্ত করলেন। এই কাজটি তাঁর সমাজসেবায় দক্ষতা ও গভীর প্রজ্ঞার নিদর্শন।

'মানসিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের ভিত'— তাঁর নিজস্ব এই ভাবনার বাস্তবায়নে ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র যুবকদের এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন। এই মহান মনীষীর জন্মশতবর্ষে জানাই তাঁকে শতকোটি প্রণাম।

সমাবেশ সমাচার

ঈশ্বরপুরে বিশাল রামনবমীর শোভাযাত্রা

উত্তর দিনাজপুর জেলার ঈশ্বরপুরে গত ২৮ মার্চ রামনবমী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এলাকার ৫০ হাজার হিন্দু

নরনারী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঈশ্বরপুর টাউন সমিতি এদিন শ্রীরামপূজার আয়োজন করে। এদিন সকাল থেকেই দলে দলে হিন্দু জনসাধারণ স্থানীয় ফার্ম কলোনি হাইস্কুল মাঠে জমা হতে থাকেন। শোভাযাত্রা হাইস্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে জাতীয় সড়ক, বাসস্ট্যান্ড, কোর্ট মোড় অতিক্রম করে নেতাজীপল্লীতে শেষ হয়। চার ঘণ্টা ধরে শোভাযাত্রা চলে। শ্রীরামপূজা ও শোভাযাত্রায় এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক দলের হিন্দু সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় সিপিএমের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি বিকাশ দাস বলেন, শোভাযাত্রায় দল হিসেবে কেউ অংশ নেয়নি হিন্দু হিসেবে অংশ নিয়ে থাকতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শোভাযাত্রায় ৫০ হাজার হিন্দুর স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রী আবদুল করিম চৌধুরী তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানিয়ে নমস্কার করেছেন। ঈশ্বরপুরে এই প্রথম হিন্দুরা রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে শ্রীরামের নামে একত্রিত হলেন।

পরলোকে জগদীশ ত্রিপাঠী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক জগদীশ ত্রিপাঠী গত ১২ মার্চ, ২০১৫ দিল্লীতে পরলোকগমন করেছেন। ওই দিন বিকেলে আকস্মিক মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৩ মার্চ দিল্লীর নিগমবোধঘাটে তাঁর অন্তিম সংস্কার হয়। জগদীশজীর জন্ম ১৯৩৬-এর ৩ জানুয়ারি উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ায়। তাঁর পিতা শিবদত্ত ত্রিপাঠী। বাল্যকালেই (১৯৪৬) তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে যথাক্রমে সঙ্ঘের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেন। প্রচারক

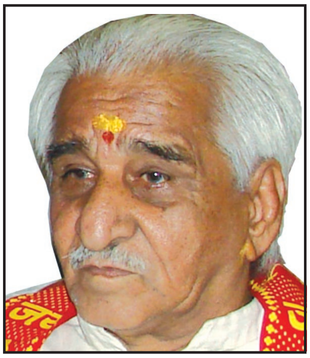

হিসেবে তিনি উত্তরপ্রদেশে পুরণপুর, শাহজীপুর, এটা, গাজিয়াবাদ ও রামপুরে ছিলেন। ১৯৬৭-তে অসমের তেজপুরে এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগ প্রচারক ও কলকাতায় ২৬নং-এ প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ ছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ভাউরাও দেওরসের আপ্ত-সহায়ক ছিলেন। এরপর তিনি উত্তরাঞ্চল উত্থান পরিষদ (আলমোড়া), বনবাসী কল্যাণ আশ্রম (সোলন), লোকভারতী (লক্ষ্ণৌ)-তে কর্মরত ছিলেন। ২০০০ সাল থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গয়া, হরিদ্বার ও বৃন্দাবনে ধর্মাচার্য সম্পর্ক প্রমুখ হিসেবে কাজ করেন। ২০০৪ সাল থেকে দিল্লীতে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থেকে পাক্ষিক 'হিন্দুচেতনা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

বারুইপুরে ভারতমাতা পূজা ও রক্তদান শিবির

গত ৮ ফেব্রুয়ারি সেবা ভারতীর উদ্যোগে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহযোগিতায় বারুইপুর রাসমাঠে ভারতমাতা পূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় পূজা আরম্ভ ও তারপর বেলা ১১টায় যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রক্তদান শিবির চলতে থাকে। পূজাপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন নদীয়া জেলার মা সারদা রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী পুণ্যলোকানন্দ মহারাজ এবং সহযোগিতায় থাকেন আরো চারজন পুরোহিত। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে স্থানীয় মানুষজন ও স্বয়ংসেবকদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পুরুষ ও মহিলা মিলে ১০০ জনের মতো স্থানীয় মানুষ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন। পুরুষ ও মহিলা মিলে ৫৬ জন রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন জেলা প্রচারক অমিত সরকার এবং সেবা ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি ডাঃ গোপাল চন্দ্র ঘোষ। বিশিষ্টদের মধ্যে অনুষ্ঠানের শুরু থেকে উপস্থিত ছিলেন

সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলা কার্যবাহ স্বপন সাহা তাঁর পিতা স্বর্গীয় জটাধারী সাহার স্মৃতি রক্ষার্থে ২০১৪ টাকা সমাজের মঙ্গল কাজে মঙ্গলনিধি হিসাবে প্রদান করেন সভাপতি শ্রী বিশ্বাসের হাতে। অনুষ্ঠানের শেষে ১০০০ লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

শোকসংবাদ

কলকাতার আহিরীটোলা নিবাসী তপন মাইতির পিতৃদেব বাসুদেব মাইতি গত ১৯ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ২ পুত্র ও পুত্রবধূ এবং ৫ নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

গত ২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসুদেবপুরের স্বয়ংসেবক অজয় কিশোর ৪০ বছর বয়সে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। সঙ্ঘের একটি মণ্ডলের মণ্ডল কার্যবাহ ও ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও দাদা, বৌদিকে রেখে গেছেন।

***

সিউড়ির প্রথম দিকের স্বয়ংসেবক প্রয়াত ব্রজকিশোর বড়ালের সহধর্মিণী ছায়ারানী বড়াল গত ২১ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ১ কন্যা ও ১০ নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর সব পুত্রই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তাঁরা সঙ্ঘ এবং বিবিধ সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর প্রয়াণে সিউড়ির স্বয়ংসেবকরা একজন মাতৃসমাকে হারালো।

মঙ্গলনিধি

বারুইপুর মহকুমা শারীরিক প্রমুখ ও নগর স্বস্তিকার কার্যকর্তা শ্যামল কুমার দে-র শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর মাতা শ্রীমতী অণিমা দে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি শিবদাস বিশ্বাসের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারক বিজয়কুমার পাতর, সুন্দরবন জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী, জেলা প্রচারক অমিতকুমার সরকার ও জেলার অনেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

***

হুগলী জেলার নবগ্রামের স্বয়ংসেবক অনির্বাণ দেব ও শ্রীমতী রিমা দেবের একমাত্র পুত্র অদ্রীশ দেবের মুখেভাত উপলক্ষে তাঁর মামা সুমন ঘোষ গত ২২ মার্চ মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ প্রতাপ দত্তগুপ্তের হাতে।

কলকাতা পুরভোটে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুরভোটকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজনৈতিক আবহাওয়া। কলকাতায় ১৪৪টি ওয়ার্ডে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মুখোমুখি তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ।

এই নির্বাচনে বিজেপি এক উল্লেখযোগ্য ফলাফলের আশা করছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি-র সহ-সংগঠন সম্পাদক সুব্রত চ্যাটার্জি বলেন, তৃণমূল-সিপিএম গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে জেরবার। ক্ষমতায় থাকাকালীন ওয়ার্ডগুলিতে সেভাবে কোনো কাজই করেনি সিপিএম ও তৃণমূল দুই দলই। স্বাভাবিকভাবে মানুষ চাইছে নতুন কাউকে। সেক্ষেত্রে একমাত্র বিজেপি-ই পারে উন্নয়ন ঘটাতে। এই নির্বাচনে গেরুয়া শিবির নিজেদেরকে বেশ কিছুটা এগিয়ে রেখেছে অন্যদের থেকে। তার মধ্যে প্রায় ৪০টি ওয়ার্ডে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হবে বলে তাঁদের দাবি। বিজেপি এই নির্বাচনে প্রচার অভিযান চালাচ্ছে জোরকদমে। ওয়ার্ডগুলিতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন। বাসিন্দারা বিভিন্ন অসুবিধার কথা তাঁদের কাছে তুলেও ধরছেন। এক্ষেত্রে বিজেপির সহ-সংগঠন সম্পাদক সুব্রতবাবু বলেন, আমাদের প্রতি মানুষের আস্থা ব্যালট বক্সেও ফুটে উঠবে। মানুষ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারেন তাহলে বিজেপির পুরবোর্ড দখল করাও কোনো ব্যাপার নয়।

তিনি আরও বলেন, আমাদের উপর শাসকদলের কর্মীরা হামলা চালাচ্ছে। সমস্ত ওয়ার্ডের দলীয় পতাকা, ব্যানার সব ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কলকাতার ৫৮ নং ওয়ার্ডে পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বেশ কিছু বিজেপি কর্মীকেও মারধর করা হয়। ইতিমধ্যে নদীয়ার গয়েশপুর এবং হুগলী জেলার তারকেশ্বর ও আরামবাগ পুরসভা সিপিএমের কায়দাতেই তৃণমূল দখল করেছে। মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েও শাসকদলের হুমকির ও অত্যাচারের জেরে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে বিজেপি। কলকাতা পুরভোটেও এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রয়েছে। অবশ্য এত কিছু সত্ত্বেও বিজেপি দমতে নারাজ। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করব। কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতায় এলে কাজ করাটা আরও সুবিধা হবে। যে সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন সমস্যা আছে তা মেটানোর চেষ্টা করব। তবে মানুষ তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেসকে ছেড়ে বিজেপিকে কেন ভোট দেবে— এই প্রশ্নের উত্তরে সুব্রতবাবুর অকপট জবাব, তৃণমূলের পক্ষে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়। মানুষের আস্থা রয়েছে বিজেপি-র উপর। নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতায় এসে যে সমস্ত কমসূচি গ্রহণ করেছে তাকে মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে। মানুষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তি চায় যা তৃণমূল দিতে ব্যর্থ। তাই এবার পুর নির্বাচনে মানুষ বিজেপি-কে জয়ী হিসেবে দেখতে চাইছে।

আয়ুষ্মান ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের ঐতিহ্যগত ওষুধকে জনপ্রিয় করার জন্য মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই আয়ুষমন্ত্রক গঠন করেছে। এই মন্ত্রকের উদ্যোগে এখন দূরদর্শনে সাপ্তাহিক ‘আয়ুষ্মান ভারত’ নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল ২০১৫ থেকে দূরদর্শনের ৯টি কেন্দ্র থেকে এই অনুষ্ঠানের সম্প্রচার হবে। সম্প্রতি আয়ুষ মন্ত্রী শ্রীপাদ নাইক এই কথা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, আয়ুর্বেদ, যোগ, ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি সহ নয়টি চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরও উন্নতভাবে কাজে লাগানোই আয়ুষ মন্ত্রকের উদ্দেশ্য। গত তিন বছর ধরে প্রচেষ্টার ফসল এই অনুষ্ঠান। ২০১২ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোলাম নবি আজাদ এই অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। দেশের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যেই কেন্দ্র সরকারের এই উদ্যোগ।

বিশেষজ্ঞ ও আয়ুষ চিকিৎসকরা স্থানীয় ভাষাতেই এইসব পদ্ধতির লাভগুলি দর্শকদের কাছে তুলে ধরবেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন দর্শকরা সরাসরি ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জলদূষণ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২২ মার্চ যখন বিশ্ব জুড়ে ‘আন্তর্জাতিক জলদিবস’ পালন করা হচ্ছে। জনসংখ্যার চাপ ও দূষণের কারণে জল সংকটের আশঙ্কায় প্রত্যেককে জলসংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে, সে সময়ই জলদূষণের এক ভয়াবহ অবস্থা আমাদের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। ভারতে জলদূষণের অবস্থা দেখভালের দায়িত্ব প্রধানত পালন করে থাকে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (সিপিসিবি)।

সম্প্রতি সিপিসিবি-র এক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সারাদেশে জুড়ে প্রতিদিন প্রায় নর্দমার অপরিশোধিত ৩৭০০০ মিলিয়ন লিটার জল নদীগুলিতে গিয়ে মিশছে। দেশের ২৭৫টি নদীতে ৩০২টি নালা-নর্দমা দিয়ে শহরগুলির ও কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ সারা বছর ধরেই নদীতে গিয়ে পড়ছে।

গত ২৬ মার্চ ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটি (এন জি আর বি এ)-র বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাজ ও কথার মধ্যে যে ফারাক রয়েছে তার প্রতি নজর দেওয়ার উপর জোর দেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
6 April - 2015

প্রকাশিত হবে ১৩ই এপ্রিল '১৫

স্বস্তিকা

মূল্য ১৫ টাকা

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা – ১৪২২

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন কোন পথে?

প্রশাসনের অপেক্ষা না রেখেই পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উত্তরপাড়ের মানুষ নিজেদের উত্তরবঙ্গ বলে পরিচয় দেয়। নদী-নালা, খালবিল, পুকুরে ভরা এই অঞ্চলের মানুষ মূলত কৃষিজীবী। শিল্প বলতে চা-বাগিচা। যদিও সারা শরীরে নানা শিল্প-সম্ভারের উপকরণ সাজিয়ে রেখে অপেক্ষা করছে তার অহল্যাভূমিতে কোনো রামের উপস্থিতি। অন্যদিকে দার্জিলিং-এর হিমালয় পর্বতমালা, টাইগার হিলের সূর্যোদয়, বক্সা-ডুয়ার্স বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী দর্শন, চা-বাগানের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, নদী-নালা-ঝোড়া, কোচবিহারের রাজস্থাপত্য, প্রাচীন মন্দির ও প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন— সব মিলিয়ে পর্যটনের উর্বর ক্ষেত্র। তবুও তুলনায় পিছিয়ে থাকা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন কোন পথে— তারই খোঁজে কলম ধরেছেন সৌমেন নাগ, দেবব্রত চাকী, সাধন পাল, তরুণ পণ্ডিত, তপন সরকার, অরুণ সাহা, গৌতম সরকার প্রমুখ।

সম্পূর্ণ রঙিন।। সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।